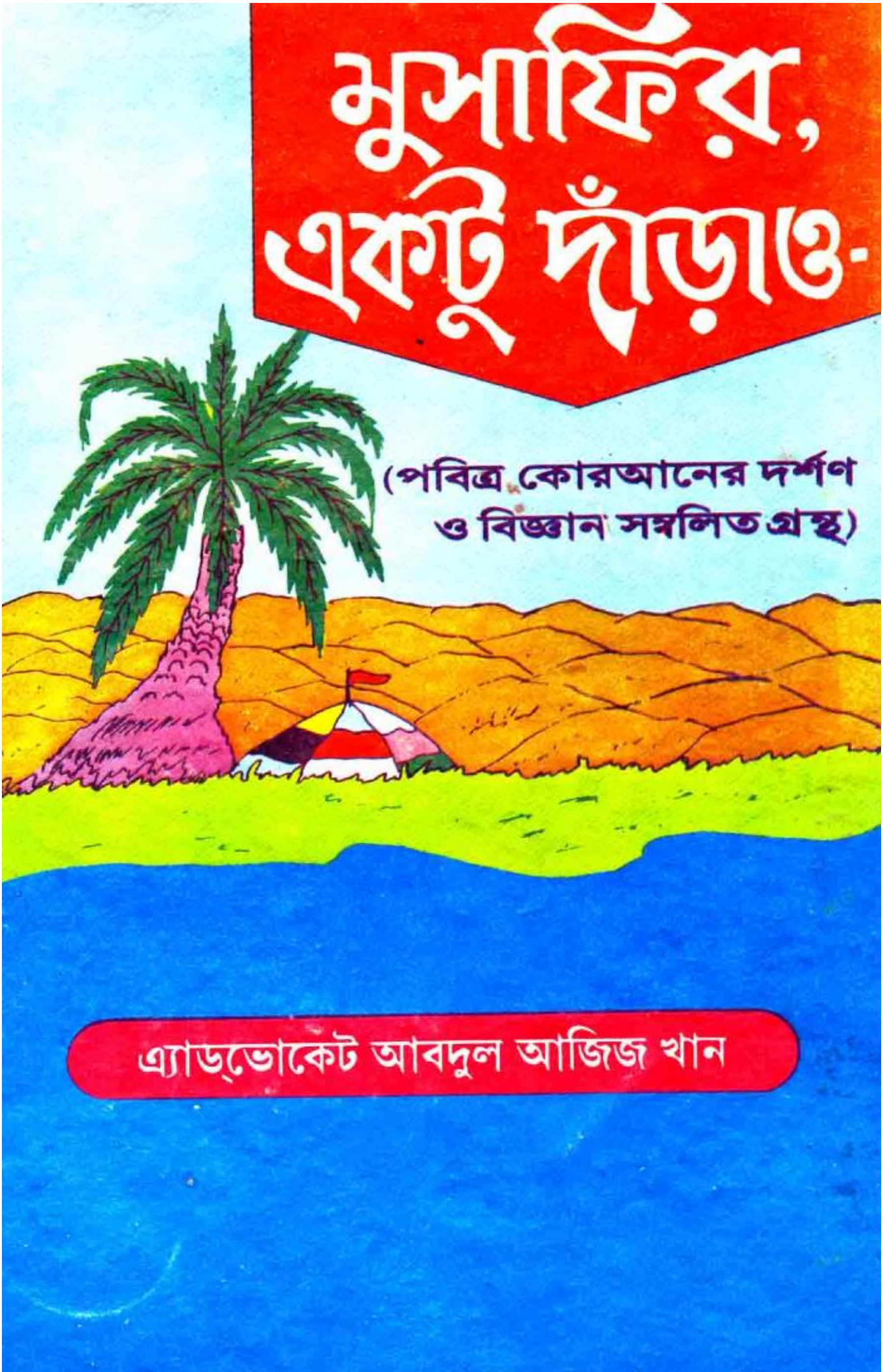
মুসাফির,
একটু দাঁড়াও-
(পবিত্র কোরআনের দর্শন
ও বিজ্ঞান সম্বলিত গ্রন্থ)
এ্যাডভোকেট আবদুল আজিজ খান

'মুসাফির একটু দাঁড়াও'

মোঃ আব্দুল আজিজ খান
এম, এ এল, এল, বি
এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, পাবনা।
পোঃ পাবনা, জেলা, পাবনা।

প্রকাশিকাঃ

মোছাঃ রওশনারা খান হেলেন।
রুশো-রুমী প্রকাশনী।
গ্রাম, মালিকা
ডাকঘর-রাইপুর ক্ষেতুপাড়া
থানা-সুজানগর
উপজেলা-সুজানগর
জেলা-পাবনা

প্রাপ্তিস্থান ও যোগাযোগের ঠিকানাঃ

মোঃ আব্দুল আজিজ খান
এম, এ এল, এল, বি
এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, পাবনা
পোঃ পাবনা, জেলা, পাবনা।

প্রথম প্রকাশঃ-১৯৯০ইং---১৩৯৭বাং।
সর্বসত্বঃ-লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত।
প্রচ্ছদঃ-জয়নুল আবেদীন মাহবুব, পাবনা
কম্পিউটার মুদ্রনেঃ-হেলাল প্রেস, বগুড়া। ফোনঃ ৫২৭৫, ৬৫৪৪
বাঁধাইয়েঃ-হেলাল প্রেস, বগুড়া।
মূল্যঃ- ৫০·০০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

"MUSAFEER EKTU DARAW"

[Traveller wait a bit". A Book with the philosophy of holy Quran & Science]

Written in Bengali by
Md. Abdul Aziz Khan
M.A L.L.B.
Advocate Judges Court, Pabna.
[Pabna District Advocate Bar Association]
P.O. Pabna, Dt. Pabna.
Price- TK. 50.00 (Inland)
U. S. $ 5.00. only.

"মুসাফির, একটু দাঁড়াও"

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী দাদা–মরহুম আমানত আলী খান,
জান্নাতবাসী পিতা–মরহুম শহিদুর রহমান খান,
জান্নাতবাসী চাচা–মরহুম শফি উদ্দিন খান,
মরহুম আব্দুল মান্নান খান,
মরহুম পীর কেবলা–মাওলানা মতিয়ার রহমান
জান্নাতবাসী শিক্ষক–মরহুম ডক্টর কছিমুদ্দিন মোল্লা,
মরহুম ডক্টর আব্দুল গণি সাহেবানদের আত্মার মাগফেরাত কামনায়–
এবং
গর্ভধারিনী পূন্যবতী মাতা মোছাম্মাৎ জুবায়েদা খানম
ও শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আল্‌হাজ্ব আব্দুল করিম,
এবং পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক–
ডক্টর মুহম্মাদ মুজিবর রহমানের পবিত্র করকমলে–

অধম সন্তান
মোঃ আব্দুল আজিজ খান।

আশীর্ব্বানী

পাবনা জজ কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও সুসাহিত্যিক জনাব আব্দুল আজিজ খান রচিত "মুসাফির একটু দাঁড়াও" বইটি সুখপাঠ্য, গবেষনাধর্মী এবং তথ্যবহুল।

আমি আল্লাহর সমীপে আন্তরিকভাবে লেখকের কল্যাণপ্রদ ও সাফল্য মন্ডিত এবং সুন্দর ও সার্থক দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান।
প্রফেসর আরবী বিভাগ
রাজশাহীবিশ্ববিদ্যালয়।

—ঃ মুবারক বাদ ঃ—

পাবনা জজ কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও সুসাহিত্যিক এবং যুক্তিবিদ জনাব আব্দুল আজিজ খান রচিত 'মুসাফির একটু দাঁড়াও' গ্রন্থটি গবেষনাধর্মী, তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ।

আমি আল্লাহর সমীপে গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও গ্রন্থকারের কল্যাণপ্রদ এবং সফল দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ডঃ মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক
আরবী ও ইসঃ ষ্টাডিজ বিভাগ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

ভূমিকা

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যখন দেখেছিলাম-তখন তিনি ছিলেন নির্বাক। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল–যেন আমি বিশাল মরুভূমির মাঝে এক নির্বাক বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে উন্মুক্ত সমীরণে শান্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ছি। পৃথিবীর সকল বৃক্ষ নির্বাক হলেও তাদের যে জীবন আছে, বাংলাদেশী বিজ্ঞানী তা' আবিষ্কার করলেও–তখনই যেন আমার চিন্তা–চেতনায় তা' নবতরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মানুষ–আশরাফুল মখ্‌লুকাত। তাদের জীবন বা আত্মা আছে। কিন্তু তারা নির্বাক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে তাদের ভাষা, তাদের বাকশক্তি স্বতন্ত্র–বৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো–এই আত্মা কি? সেটি নশ্বর, না–অবিনশ্বর?

আমাদের সামনে পবিত্র কোরআন এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর সঠিক জবাব পেশ করেছেন গ্রন্থকার বন্ধুবর আব্দুল আজিজ খান সাহেব। তিনি শুধু লেখকই নন, একজন স্বনামখ্যাত আইনজীবি এবং আইন কলেজের অধ্যাপকও।

তাঁর সুচিন্তিত এবং স্বাধীন চিন্তাধারায় শুধু আত্মার কথাই উঠে আসেনি, উঠে এসেছে–পবিত্র কোরআন ও বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমান দ্বারা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব। উঠে এসেছে মানব মন্ডলীর নাট্যমঞ্চ পরিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়। এখানে যার যার নাট্যমঞ্চে সে সে একক নটরাজ। শরিয়ত, মারেফাত, হাকিকত, তরিকত, সুফিমত, মে'রাজ প্রভৃতি বিষয়ক পবিত্র কোরআন ভিত্তিক জটিল আলোচনা এবং বিজ্ঞানের আলোকে বিঘোষিত হয়েছে বিদ্যুৎ এর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মে'রাজের প্রামান্য তথ্য। যেহেতু আরবী "বার্‌ক" শব্দের বাংলা অর্থ বিদ্যুৎ। বারক শব্দ হতেই 'বোরাক' শব্দের উৎপত্তি। বোরাক মে'রাজ রজনীতে আমাদের রাসুলে করীম (সঃ) এর বাহন ছিল। তাই মে'রাজ যে সত্য ঘটনা–এ কথা গ্রন্থকার দ্ব্যর্থহীন চিত্তে ঘোষনা করেছেন।

আধুনিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসার সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত ও সুফল এবং আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রেখেছেন গ্রন্থকার। তা'ছাড়াও জনাব খান সাহেব আর একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষনাধর্মী নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন এই গ্রন্থে। বিষয়টি 'জেনেটিক্স'। ইটিতে লেলিন, ডারউইন ছাড়াও মোরতাদ সালমান রুশদীর মত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বানোয়াট চিন্তা–চেতনাকে ভুল বলে প্রমান করেছেন খান সাহেব।

বইটির শিরোনাম–'মুসাফির, একটু দাঁড়াও।' এখানে মুসাফির কে? কে দাঁড়াতে বল্‌ছে? কি তার আকৃতি?

গ্রন্থটির দীর্ঘ সড়ক বেয়ে যেন এক অজানা তেপান্তরের পথিক হেটে গেছে–পায়ের তলার কঠিন মাটিতে আঁচড় কেটে কেটে। তার কণ্ঠনিঃসৃত সবার্কবানী যেন কল্যাণের জন্যই প্রতিটি মানুষের কর্ণকুহরে উচ্চারিত হয়েছে সোচ্চার হয়ে।

লেখকের দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় বইটি যেন "ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায় চপল ছেলের মত।' একজন সফল লেখকের মুন্সিয়ানা তো এখানেই। সারা বছর স্কুলের হাজিরা খাতায় ছাত্র হয়ে–পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে, সে কি ছাত্র? ছাত্র হতে হলে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে লেখাপড়া করতে হবে, সাধনা করতে হবে।–"পশু–পাখি সহজেই পশুপাখি, তরুলতা সহজেই তরুলতা, মানুষ অনেক চেষ্টার ফলে–তবেই মানুষ।" একজন সাহিত্য সাধককে ঠিক সেই ভাবেই গড়ে উঠতে হয়।

বইটি পুরোপুরি পড়লে অনুভব করা যাবে–লেখক যেন অথৈ সমূদ্রে বার বার দক্ষ ডুবুরীর মত ডুব দিয়ে দিয়ে তুলে এনেছেন অসংখ্য মূল্যবান মনি মুক্তা।

ছাত্র–শিক্ষক, কবি–সাহিত্যিক, গবেষক, বিজ্ঞানী,ওয়ায়েজীন ময় শিক্ষিত পাঠকবর্গের দৃষ্টি আর্কষণ করবে বইটি–এ বিশ্বাস আমি রাখি। রেডি রেফারেন্স হিসেবে তো বটেই।

এ কারনেই আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আমিন।

জয়নুল আবেদীন মাহবুব
কাব্যরত্ন, কবি কঙ্কণ(কলিকাতা);
সাধারণ সম্পাদক–

পাবনা জেলা সাহিত্য পরিষদ,
পাবনা।

'কবিকানন'
কাচারী পাড়া
(পুলিশ মাঠের পশ্চিমে)
পাবনা–৬৬০০
শরৎ,১৩৯৭ বাংলা
(১৯৯০ ঈসাই)

০০০
০০
০

লেখকের কথা

পাবনা শহরের লাইব্রেরী বাজারে একদিন বিকালে বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "স্যার! এম· এ· পাশ করিয়াছেন, "ল" পাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের ও জাতির জন্য কি দিয়াছেন?" ঐ কথা কয়টি আমার হৃদয়ে খুব আঘাত হানিল। হঠাৎ করিয়া মনে পড়িল আমার মরহুম পিতার কয়টি কথা। আমার পিতা মরহুম শহীদুর রহমান খান ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি তোমার কাছে কোন টাকা-পয়সা চাইনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় খেতাব দেখিয়াও আমার ভালো লাগে না; আমার ভাল লাগে তখনই যখন আমি মানুষের মুখে তোমার জ্ঞানার্জনের কথা শুনিতে পাই। আমি চাই তুমি নামাজ-কালাম পড়, পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টাকর।"

সুধী পাঠকবৃন্দ! ঐ সকল কথা চিন্তা করিয়া সুদীর্ঘ দিন যাবৎ পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া "মুসাফির, একটু দাঁড়াও" নামকরনে এই গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম। ইহাই আমার জীবনের পরম স্বার্থকতা।

গ্রন্থটির প্রথম দিকে মুসাফিরের অবতারনা পাঠ করিয়া হয়তো মনে হইবে লেখক কল্পনা প্রসুত মন-মানসিকতা ব্যবহার করিয়াছেন।

কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের একটি তৃতীয় নয়ন থাকে এ কথাও ঠিক। আর ঐ তৃতীয় নয়নে তাঁহারা অনেক কিছুই দেখিতে পান এ কথাও মিথ্যা নয়।

কবি নজরুল ইসলামকে ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একটানা চৌত্রিশ বৎসর নিশ্চল-নিশ্চুপ ও নির্বাক জীবন যাপন করিতে হইবে; এই কথা কি তিনি পূর্বেই জানিতেন?

তিনি যদি ঐ বিষয়টি পূর্বেই না জানিতেন, তাহা হইলে কি ভাবে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ-

"তোমার পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিবনা।
কোলাহল করি সারাদিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিবনা।
নিশ্চল-নিশ্চুপ আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধুপ।"

আর কি করিয়াই বা কবি লিখিয়াছেনঃ-

"ফুলের জলসায় নিরব কেন কবি?"

নিশ্চয়ই কবি তাঁহার তৃতীয় নয়ন দ্বারা আবলোকন করিতে পারিয়াছিলেন, ঐ নিশ্চল, নিশ্চুপ ও নির্বাক দৃশ্য।

যেমন, কবির জন্মদিনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। ফুলে-ফুলে ভরিয়া গিয়াছে তাঁহার চতুস্পার্শ্ব। আর সেই ফুলের জলসায় কবি বসিয়া আছেন নিশ্চুপ ও নির্বাক। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছেন তিনি।

এখন প্রশ্ন-সেই তৃতীয় নয়নটি কী সহজলভ্য না দুর্লভ? ঐ তৃতীয় নয়নটি অর্জন করা কি যে কঠিন ও দুঃসাধ্য তাহা তিনিই জানেন, যিনি অর্জন করিয়াছেন।

"মুসাফির, একটু দাঁড়াও" গ্রন্থটি কোন কাল্পনিক উপন্যাস নহে। আপাতঃদৃষ্টিতে "মুসাফির" এর অবতারনা কাল্পনিক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে কাল্পনিক নহে, বরং পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিধৃত হইয়াছে এক বাস্তব সত্য।

গ্রন্থটি লেখায় বিভিন্ন বই পুস্তক যোগান দিয়া সাহায্য করিয়াছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর–আল্‌হাজ্ব আব্দুল করিম সাহেব। পত্র–পত্রিকা যোগান দিয়া ও অনুপ্রেরনা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন অতিরিক্ত জেলা লাইফ ষ্টক অফিসার বন্ধুবর আলতাফ হোসেন, পাবনা ডি, সি, অফিসের অবসরপ্রাপ্ত নাজির জনাব মাহমুদুল হক ও পৈলানপুর নিবাসী আমার বাল্যবন্ধু মহসীন আলী বিশ্বাস। পাবনা জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ও আমার শ্রদ্ধেয় সিনিয়ার আল্‌হাজ্ব গোলাম হাসনায়েন সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া আরিফপুর গোরস্থানে গিয়াছেন এবং ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমস্ত কবরগুলি দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর উপর ধারনা এবং অনুপ্রেরনা পাইয়াছি। বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরনা ও সহানুভূতি প্রকাশ এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, বার সমিতির সভাপতি, সিনিয়ার এ্যাডভোকেট জনাব আল্‌হাজ্ব গাজীউর রহমান এবং সিনিয়ার এ্যাডভোকেট আব্দুস ছামাদ সাহেব।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ সম্পর্কে বিষয় বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সুচিন্তিত ও রুচিসম্পন্ন ধারণা দিয়াছেন, বার সমিতির সেক্রেটারী, সিনিয়ার এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুর রাজ্জাক। অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং নিজ হাতে প্রচ্ছদটি অংকন করিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞ করিয়াছেন, পাবনার কৃতি সন্তান কবি জয়নুল আবেদীন মাহবুব। পাবনা জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতির কর্মচারী স্নেহাস্পদ সেলিম নিরলসভাবে পরিশ্রম করিয়াছে। চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা সরবরাহের কাজে।

অত্র গ্রন্থটি লেখার কাজে বিজ্ঞানের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জনাব আব্দুল কাদের।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আতফুল হাই শিবলী। তাহার মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়া গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পড়িয়া দৃষ্টিকটু ও আপত্তিকর বিষয়গুলি সনাক্ত করিয়া তাহা সংযোজন না করার জন্য উপদেশ দিয়া চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ মুজিবুর রহমান ও ডঃ আব্দুস সালাম গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং মূল্যবান উপদেশ প্রদান সহ আশীর্ব্বানী লিখিয়াদিয়াছেন।

অত্র গ্রন্থের পান্ডুলিপি পাঠ করিয়া পরিমার্জন ও সংশোধনে বিশেষ সহযোগীতা প্রদান করিয়াছেন নওগাঁ শহর নিবাসী মুসলিম রেনেঁসার কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মরহুম ডঃ কছিমুদ্দিন মোল্লা ও মরহুম ডঃ আব্দুল গনি সাহেবানদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য তাঁহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করিয়া এই অধম ছাত্রের ঋনের বোঝা কিছুটা হালকা করার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থটি লেখা ও প্রকাশের কাজে যার অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য তিনি আমার সহধর্মিনী রওশনারা খান হেলেন।

সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই মুবারকবাদ। সুধি পাঠক–পাঠিকাবৃন্দের আত্মিক ও মানসিক উন্নতি ও প্রশান্তি আনয়নে এবং ছাত্র–ছাত্রীদের চরিত্রগঠন ও জ্ঞানার্জনে গ্রন্থটি সহায়ক হইলে আমার এ ক্ষুদ্র শ্রমের স্বার্থকতা অনুভব করিব।

এ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ খান।

◇ শুভেচ্ছাবাণী ◇

মৌঃ মোঃ শহীদুল্লা
এম, এম,
মুহাদ্দেস, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা
ও খতিব তাড়াশ বিল্ডিং জামে মসজিদ।

আমি এ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ খান রচিত "মুসাফির, একটু দাঁড়াও" বই খানি স্বচক্ষে দেখিলাম। উক্ত লেখক উহাতে কোরআন করিম এর বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিস শরীফ ও বিভিন্ন মুসলীম মনিষিদের উদ্ধৃতি দিয়া মানব আত্মার ও মানব আত্মার মুক্তির বিভিন্ন পথের পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমি তাঁহার এই মহান প্রচেষ্টা খোদার দরবারে গ্রহীত হওয়ার জন্য এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আমিন।

মোঃ শহীদুল্লাহ
মুহাদ্দেস, পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা
তাং১৪-৯-৯০ ইং।

স্থায়ী ঠিকানা

(মৌঃ মোঃ শহীদুল্লা)
এম, এম,
শালগাড়ীয়া টি, পি, রোড, পাবনা।

•• শুভেচ্ছা বাণী ••

কবি মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক
কুরছিয়া মহল
চকদেব (জনকল্যান পাড়া)
নওগাঁ।

পাবনা জেলা জর্জ কোর্টের স্নেহভাজন এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল আজিজ খান বিরচিত ''মুসাফির একটু দাঁড়াও'' গ্রন্থটি পাঠ করে আমার নিকট খুব ভালো লেগেছে।

এই অমূল্য গন্থের রচনা শৈলী এক বিশেষ ভংগিমায় রচিত। ভাষা সাবলীল, প্রাঞ্জল, সহজ–সরল ও গতিময় ছান্দসিক। ফলে গ্রস্থটি গবেষণা ধর্মী হলেও বিদগ্ধ সাধারণ পাঠক–পাঠিকার হৃদয়–মন আকৃষ্ট ও মোহময় করে তুলতে যে পারঙ্গম, তাতে আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী। গ্রন্থটি একবার পাঠ আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। লেখক এইখানেই সফল হয়েছেন তা জোর দিয়েই বলা যায়।

প্রতিভাদীপ্ত প্রজ্ঞাবান লেখক তাঁর স্বকীয় চিন্তা চেতনার গভীরে প্রবেশ করে দক্ষ ডুবুরীর মতো গবেষণা প্রসুত অভিজ্ঞানের সাগর তলা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে অমূল্য জ্ঞানের মুক্তা ও সুক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আহরন করে তা' সুধী পাঠক মন্ডলীকে উপহার দিতে সমর্থ হয়েছেন–এ মূল্যবান গ্রন্থটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

পাক–কোরআন ও হাদিস সমূহের অমূল্য উদ্ধৃতির সমাহারের পাশাপাশি সেই সমস্ত পূতবানীর আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির সুপ্রচুর মূল্যায়ন ঘটিয়েছে। এতে বোধ করি কারোই দ্বিমত নেই। ইসলামী জগতে এহেন গ্রন্থটির সংযোজন আরেকটি সৎ গন্থের যে সংখ্যা বাড়লো তাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান বৈরী সময় কালে ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ করা কি যে ঝুঁকি পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা তথাপি বস্তুবাদী সাহিত্যের ছড়া ছড়ির ও সেই প্রভাবিত মন–মানসিকতায় গড়া পরিবেশের মধ্যে সাহসী লেখক নির্ভিক ভাবে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ধারন করেছেন, সমস্ত প্রতিকুল কালো স্রোতের বিরুদ্ধে। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ন গ্রন্থখানি সকল প্রকার পাঠককে পঠনের জন্য আহ্বান জানাই। এতে আশা করি তাদের বিরুদ্ধ বাদী মন–মানসিকতার পরিবর্তন হতে পারে।

এই প্রসংগে বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

স্নেহভাজন এ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ খানের এহেন মহতী প্রচেষ্টা ও সৎ উদ্যোগকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞ লেখখেরই স্বদেশ–স্বজাতির মন–মানস পঠনোপযোগী অনুরুপ আরও উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ উপহারের আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পাকশাহী দরবারে স্নেহভাজন লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং তাঁর এ মহৎ ও সৎ প্রচেষ্টা এবং অকৃতিম সাধনার পুত শ্রমটুকু কবুলের জন্য অশেষ দোওয়া রইলো।

কুরছিয়া মহল
চকদেব (জনকল্যান পাড়া), নওগাঁ।

মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক
৪/৯/৯০

শুভেচ্ছা বাণী

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ খান, এডভোকেট, পাবনা "মুসাফির একটু দাঁড়াও" নামকরনে যে বইখানা লিখিয়াছেন উহার পান্ডুলিপিখানি দেখিলাম। আইন পেশায় লিপ্ত থাকিয়া অত্যান্ত ব্যস্ততার মাঝেও কিছু সময় ব্যয় করিয়া পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে, বিভিন্ন পুস্থক ও পত্র পত্রিকা হইতে অনেক মূল্যবান বিষয় সংগ্রহ করিয়া মানবজীবনের সীমারেখা এবং জীবনের পরিনতি ও পারলৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করায় আমি তাঁহার এই সাধনার প্রশংসা করি এবং তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হোক ইহাই কামনা করি।

আলহাজ মোঃ গাজিউর রহমান
এডভোকেট,

সভাপতি
জেলা এডভোকেট বার সমিতি
পাবনা।

শুভেচ্ছা বাণী

জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি পাবনা এর অন্যতম সদস্য স্নেহাস্পদ এ্যাড্ভোকেট আব্দুল আজিজ খান এর আইন পেশার ব্যস্ততার অবকাশে কঠিন পরিশ্রমের ফসল গভীর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত গবেষণাধর্মী তাহার বিরচিত "মুসাফির একটু দাঁড়াও" গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পাঠ করিয়া উপলব্ধি করিতেছি গ্রন্থটিতে পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে মানুষের ইহলৌকিক, পারলৌকিক বহুবিধ গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ও তত্ত্ব অতীব সুন্দর সাবলিল ভাবে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। যাহা সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের কল্যানে আসিবে।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার, লেখকের দীর্ঘায়ু এবং মানব কল্যানে তাহার লেখনী আরও গতি সম্পন্ন হউক, ইহা কামনা করি ও পরম করুনাময় আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোওয়া করি।

শুভেচ্ছান্তে

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
সিনিয়র এ্যাড্ভোকেট
সম্পাদক, পাবনা জেলা এ্যাডভোকেট
বারসমিতি–পাবনা।

শুভেচ্ছা বাণী

স্নেহাস্পদ এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল আজিজ খান বিরচিত ''মুসাফির একটু দাঁড়াও'' বইটির পান্ডুলিপি দেখলাম।

বইটির রচনাশৈলী খুবই সুন্দর ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। জনাব খান সাহেব অত্যান্ত দক্ষতার সাথে মনমুদ্ধকর বিভিন্ন বিষয়াদি, মানব জীবন, আত্মার পরিনতি, শরীরের পরিনতি, ইহকাল ও পরকালের বিভিন্ন দিক এবং ইসলামের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করায় বইটি মর্য্যাদা সম্পন্ন এবং একটি অমুল্য গ্রন্থ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বইটি মানব সমাজের জন্য তথা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি শুভ বার্তা বহন করিয়া আছে। আমি আল্লাহর নিকট বইটির বহুল প্রচারের জন্য দোয়া করি এবং লেখকের সৎ প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি, আমিন।

(মোঃ মাহমুদুল হক)
অবসর প্রাপ্ত নাজির, ডি, সি অফিস পাবনা
সাধুপাড়া, নীল কুঠি, পাবনা।

—ঃ শুভেচ্ছা বাণী ঃ—

ডাঃ মোঃ আলতাফ হোসেন
বি, এস, সি
(ভ্যাটেরিনারী সায়েন্স এন্ড এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী)
বি, সি, এস (লাইফ ষ্টক)
অতিরিক্ত জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, পাবনা
তাং–ইং১৫–৯–৯০

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ খান, এ্যাডভোকেট সাহেব রচিত "মুসাফির একটু দাঁড়াও" বইটি পাঠ করার সৌভাগ্য হ'ল। জনাব খান সাহেব তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও মুসলিম জাহানের জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহারদিয়েছেন।

বইটি রচনায় জনাব খান সাহেব যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার প্রমান রয়েছে বইটির প্রতিটি পাতায় পাতায়। ধর্মীয় বই পুস্তক সাধারনত নিরস হয়। কিন্তু "মুসাফির একটু দাড়াঁও" বইটিতে কিছু সাহিত্য রস আছে যা বইটি পড়ার সময় আমার মনকে সর্বক্ষন আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

বইটি মুসলিম জাহানের উপকারে লাগবে বলে আমি মনে করি। সেই সাথে আমি বইটির বহুল প্রচার ও জনাব খান সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ডাঃ মোঃ আলতাফ হোসেন

অতিরিক্ত জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, পাবনা।

❀ শুভেচ্ছা বাণী ❀

বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে তথা গ্রন্থরাজির মেলায় যখন অপ-সাংস্কৃতি-চর্চা আর অপাঠ্য বইয়ের ভীড়, তখন নবীন সাহিত্যিক ও গবেষক আঃ আজিজ খানের "মুসাফির একটু দাঁড়াও" গ্রন্থটিকে সাহিত্যে তথা সামাজিক, মানষিক ও ধর্মীয় জগতে একটি "আলোক-বর্তিকা"র সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

বইটিতে লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে "কোরআন" ও "বিজ্ঞান" এর জৈবিক দিকগুলোর নিখুঁত ও চুল-চেড়া বিশ্লেষণ করে জাগতিক দুনিয়ার সাথে পার্থিব দুনিয়ার এক অপূর্ব সংশ্লেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

"মানুষ" শব্দটির অর্থ কি, "মানুষ" আর "আত্মার সাথে আভিধানিক পার্থক্য, বিশেষ করে "মানুষ মরে না" এই বিতর্কিত কথাটির চরম মিমাংসা দিতে লেখক তার সর্বোতো চেষ্টা করেছেন।

সচেতন ও রুচিশীল পাঠক সমাজ দ্বারা বইটি সমাদৃত ও সুপ্রশংসিত হবে বলে মনে করি।

(আরিফ— হাসনাত)
সাহিত্য-সম্পাদক
শহীদ হাবিবুর রহমান হল ছাত্র সংসদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

মুসাফির, একটু দাঁড়াও'

পড়ন্ত বিকাল, গোধুলীর রক্তিম আভা পশ্চিম দিগন্তকে করিয়াছে সুশোভিত। সেই গোধূলী আকাশকে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য যায় ঐ অস্তাচলে। বহিয়া চলিয়াছে ঘুমপাড়ানো মৃদু মৃদু বাতাস। একা একা দাঁড়াইয়া আছি রাস্তার পার্শে। দুর হইতে একটি লাশ বহন করিয়া কিছু লোক এই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। লাশের সঙ্গে সব লোক 'আল্লাহ আকবার' 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি করিতেছে। সহসাই আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল, "ইন্না লিল্লাহে অইন্নাইলায়হে রাজেউন।" লাশের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন একজন মুসাফির! তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আমার মনপ্রান ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহাকে ডাক দিলাম, মুসাফির একটু দাঁড়াও! "আচ্ছা কিছুক্ষন আগে লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, তুমি মারা গিয়াছ!" এখন তুমি এই ভাবে কোথায় যাও? আমি পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে যাইতেছি।! কে বলে আমি মারা গিয়াছি? মানুষতো মরে না!"

মুসাফির একটু বল, আল্লাহ কেমন? তাঁহাকে তুমি জানিলে কিভাবে? কি ভাবে তুমি তাঁহার কাছে যাইবে? আল্লাহকে কি কেহ কোনদিন দেখিয়াছে? আর মানুষই বা মরেনা কেমন ভাবে?

বৎস! তুমি কি পবিত্র কোরআন পড় নাই? আল্লাহকে কি বিশ্বাস কর না? আর মানুষ কি, এই বিজ্ঞানের যুগে তাহাও কি পড় নাই? সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে কি বিশ্বাস কর না?

মুসাফির। আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিনা, তবে আমার ঐ সকল বিষয়ে জানার ও বুঝার খুবই ইচ্ছা। বৎস। ঐ কথাতো হযূরত ইব্রাহিম (আঃ) ও বলিয়াছেন। এইগুলি বড়ই শক্ত প্রশ্ন, তবে, যদি কোরআনপাক পড়, বোঝ, আধুনিক বিজ্ঞান পড় ও অনুধাবন কর, তবে উত্তর খুবই সোজা।

বৎস। "তুমি বুঝিতে চেষ্টা কর। আধুনিক বিজ্ঞান মটর গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে, আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্লেন তৈয়ারী করিয়াছে। জল পথে চলাচলের জন্য তৈয়ারী করিয়াছে লঞ্চ ও ষ্টিমার। যদি মটর গাড়ী, প্লেন ও লঞ্চ, ষ্টিমার হইতে তাহার ইঞ্জিনগুলি সরাইয়া নেওয়া হয়, তবে থাকিবে শুধুমাত্র বডি বা দেহ। ইঞ্জিন বিহীন ঐ সকল বডি বা দেহকে আর মটর, প্লেন, লঞ্চ বা ষ্টিমার বলা যাইবেনা। তাহা ছাড়া ইঞ্জিন ব্যতীত বডি বা দেহ, তাহাদের নিজ নিজ দায়ীত্বও পালন করিতে পারিবে না।

ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ প্রথমে মাটি দিয়া মানুষ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। পরে তাহাতে ফুৎকার দিয়া রুহ বা আত্মা দান করেন। ঐ রুহ বা আত্মাটিই হইল মানুষ। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা বকর এর ৩০, ৩১ ও ৩৪ আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

''যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাগনকে বলিয়া-ছিলেন, নিশ্চই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব।'' ফেরেস্তাগন বলিয়াছিলেন, ''তাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিবে, আমরাইতো তোমার এবাদৎ ও প্রশংসা করিতেছি এবং তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি।'' আল্লাহ বলিয়াছিলেন, ''তোমরা যাহা অবগত নহ, নিশ্চয়ই আমি তাহা জ্ঞাত আছি।''

অতঃপর আমি (আল্লাহ) আদমকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া ফেরেস্তাগনের সম্মুখে হাজির করিলাম। (আদম অর্থ মাটি হইতে সৃষ্ট) যখন আমি ফেরেস্তাগনকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবিলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করিয়াছিল, সে অনলোৎপন্ন জন্য মাটির তৈয়ারী আদমকে সেজদা করিতে অস্বীকার করিল, সে অহংকার করিল, আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়া চির অভিশপ্ত হইল।

[ব্যাখ্যাঃ—ইবলিস বা শয়তান অগ্নি হইতে সৃষ্ট জ্বেন সম্প্রদায়ের ইমাম ছিল। আল্লাহর আরাধনা করিতে করিতে সে ফেরেস্তা পদে উন্নিত হয়। কথিত আছে যে, জগতে ইবলিসের ন্যায় উপাসনা কেহই করিতে পারে নাই।]

সুরা কাহাফ ৩৭ আয়াতে বর্নিত হইয়াছে, '' আল্লাহ পয়দা করিয়াছেন তোমাদের মাটি ও পরে শুক্র হইতে, পরিশেষে দিয়াছেন মানুষ আকৃতি।'' সুরা

আল এমরান ৬ আয়াতে আছে, ''তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ু মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন।'' সূরা বনি ইস্রাইল ৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''বল, রুহ আমার রব্বের আদেশ মাত্র''। সুরা হিজর ২৬ আয়াতে বর্নিত হইয়াছে, ''আমি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি শুষ্ক মাটি হইতে।'' এই সুরার ৪ আয়াতে বর্নিত হইয়াছে, ''পরে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি বীর্য্য হইতে।'' সুরা হিজর ২৯ আয়াতে ফেরেস্তাগনকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ বলেন, ''আমি যখন তাহার আকৃতি সুঠাম করিব এবং তাহাতে আমার রুহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিও''। ফেরেস্তাগন তখন সবাই সিজদা করিল, করিল না কেবল ইবলিশ। আল্লাহ বলিলেন,'' তবে এখান হইতে বাহির হইয়া যাও।'' (সুরা হিজর ৩১,৩৪) ছুরা হুদ এর ৬১ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''তিনিই তোমাদের মাবুদ যিনি মৃত্তিকা হইতে তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।'' তাহা হইলে সুরা বকর, সুরা হিজর, সুরা কাহাফ, সুরা বনি ইস্রাইল, সুরা হুদ প্রভৃতি সুরার আয়াত গুলি হইতে নিঃ সন্দেহে বিশ্বাস করা যায় যে, মানুষকে আল্লাহ মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ছুরা হিজর এর ২৯ আয়াতে উল্লেখ আছে, ''তাহাতে আমার রুহ সঞ্চার করি।'' ইহাতে দেখা যায় যে মাটির সহিত মানুষের শরীরের সম্বন্ধ এবং আল্লাহর সহিত রুহ বা আত্মার সম্বন্ধ আছে।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, ''মানবের সম্মান ও পদর্ময্যদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে অবস্থিত। কেননা সে মহান প্রভুর পরিচয় জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব প্রচেষ্টা অবলম্বন করে, এবং সেই পরিচয় জ্ঞানই ইহলোকে তাহার সৌর্ন্দয্য, পূর্নত্ব এবং গৌরব, এবং পরলোকে মূল্যবান ও পরম সঞ্চিত ধনে পরিনত হইবে। মানুষ তাহার আত্মার দ্বারাই আল্লাহর সেই পরিচয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। মানুষ এই আত্মার পরিচয় পাইলে এবং যখন সে নিজেকে চিনিতে পারে, তখন সে আল্লাহকেও চিনিতে পারে । আর যখন মানুষ নিজ আত্মাকে চিনিতে পারেনা, তখন সে আল্লাহকেও চিনিতে পারেনা।

প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলিয়াছেন, ''তাঁর আলোতে তোর এ দেহ, হলো আলোকময়, যে দেহটির দাম নাই কোন মাটি ছাড়া কিছু নয়।'' (মসনবী)

আত্মার পরিচয় জানা ও তাহার প্রকৃত গুনাবলীর বিষয় অবগত হওয়াই ধর্মের মূল কথা এবং ধর্ম পথ যাত্রীদের ভিত্তি। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) মতে, ''কল্‌ব অর্থ হার্ট বা হৃদপিন্ড, ইহার অভ্যন্তর ভাগ শূন্য এবং সেই শূন্যস্থানে কালরক্ত বিরাজমান। সেই রক্তই মানবের রুহ বা প্রানেব উৎপত্তি স্থল।'' এই হৃৎপিন্ডই রক্ত চলাচলের কেন্দ্রস্থল বা খনি।' ঐ কাল রক্তের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত নিরাকার

লতিফা' বা মৌলিক উপাদান বা প্রানবন্ত সূক্ষ্ম অশরীরী পদার্থ আকার বিশিষ্ট হৃৎপিন্ডের মধ্যে অবস্থান করে। এই লতিফাই মানবের হকীকত বা আসল বস্তু, ইহাই আত্মা, ইহাকেই সম্বোধন, করা হয়, শাস্তি দেওয়া হয়, তিরস্কার করা হয়, অনুসন্ধান করা হয় ।'' হৃৎপিন্ডের সহিত আত্মার সেইরূপ সর্ম্পক, যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত শরীরের সর্ম্পক অথবা যে রূপ কারিগরের সহিত যন্ত্রের সর্ম্পক অথবা গৃহ অধিবাসীদের সহিত গৃহের সর্ম্পক। এই সর্ম্পক বুঝিতে গেলে রুহ বা আত্মার আধ্যাত্মিক ত্বত্ত্ব বা গুপ্ত তত্ত্ব সর্ম্পকে চিন্তা করিতে হইবে।

''হৃৎপিন্ডের অভ্যন্তরে প্রান প্রবাহ যাহা বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে সমস্ত শরীরে চলাচল করে। ইহার স্পর্শ শক্তি দর্শন শক্তি, শ্রবন শক্তি, প্রদীপের আলোর ন্যায়। ইহাই সমস্ত শরীর আলোকিত করে। এই রুহই আত্মা আর ঐ সূক্ষ্ম অশরীরী মৌলিক পদার্থকেই বলা হয় মানুষ।'' কোন কোন আত্মার উপর অজ্ঞাত ভাবে আল্লাহর এলহাম আসে এবং তজ্জন্য তাহার অধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন হয়। আর কোন কোন আত্মা পরিশ্রম ও শিক্ষা দ্বারা আধ্যাতিক জ্ঞান অর্জন করে। যাহাদের রুহানী শক্তিবেশী তাহারা শিঘ্রই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। আর যাহাদের রুহানী ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, তাহারা বিলম্বে অর্জন করে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) মতে, ''এই বিষয়ের উন্নতির কোন সীমা নাই।''

হযরত রসুল করিম (সঃ) বলিয়াছেন, ''আত্মা চারি প্রকার। ''প্রথমতঃ উজ্জল আত্মা, ইহাই মোমেনের আত্মা। দ্বিতীয়তঃ রুগ্ন বা কৃষ্ণ আত্মাঃ কাফেরের আত্মা। তৃতীয়তঃ আবদ্ধ আত্মা মোনাফেকের আত্মা। চতুর্থতঃ–মিশ্রিত আত্মাঃ– যাহার ভিতর ঈমানও আছে এবং মোনাফেকীও আছে।'' 'মুক্তির পথ' গ্রন্থে ফজলুর রহমান খাঁ আত্মা সর্ম্পকে বলিয়াছেন, ''পরম স্রষ্টা আল্লাহ সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন রুহ বা আত্মা। রুহ বা আত্মা একটি মৌলিক পদার্থ বা বস্তু। রুহ একটি আলো বা আলো সাদৃশ, আল্লাহ পাকের নূরের অপূর্ব জ্যোতির পরশে উদ্ভাসিত একটি অতীব শক্তিশালী প্রান শক্তি।''

''রুহ জন্মের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করে।

রুহ অমর, রুহের মৃত্যু বা বিনাশ নাই। রুহ কোন অবস্থাতেই তার মৌলিকত্ব বা মৌলিক গুন হাড়ায় না। রুহ আল্লাহ পাকের আদেশে আজীবন জাগতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। মাতৃ গর্ভে শিশু ভ্রন অবস্থায় পরিনতি লাভ করার কোন এক নির্দিষ্ট পর্য্যায়ে রুহের আগমন ঘটে। মানুষের বাম পার্শ্বের স্তনের দুই আংগুল নীচে তাহার অবস্থান।''

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন, ''রুহ আমার হুকুম", এই হুকুম একটি শক্তি। রুহানী তেজ বা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আত্মিক শক্তি হইতেই আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চয় ঘটে। আর এই শক্তিই মাইক্রোফন, রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটরের মত কাজ করে। আল্লাহ তাঁহার নিজগুনের পরশের ছোঁয়া দিয়া রুহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

কেহ বলেন,'রুহ খুবই শুভ্র' কেহ বলেন, ' ঈষৎ নীলাভ''।

'রুহ ঈশৎ নীলাভ, তাহার সমর্থন দিয়াছেন একজন র্জামান বৈজ্ঞানিক। ঐ র্জামান বৈজ্ঞানিক বলেন, ''নীলাভ কি যেন একটা দেখিতে না দেখিতেই প্রচন্ড বিস্ফোরন ঘটাইয়া পুরু কাঁচের সেলকে গুঁড়া করিয়া চলিয়া গেল।'' ঘটনাটি হইল র্জামান বৈজ্ঞানিকগন একটি বিশেষ সেল তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে একজন মানুষ ঢুকাইয়া দেন। অক্সিজেন অভাবে লোকটি মারা যায়, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে প্রচন্ড বিস্ফোরন। বৈজ্ঞানিকগন সকলেই প্রচন্ড বিস্ফোরনে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। একজন শুধু মাত্র বলিতে পারেন,''কি যেন একটি নীলাভ আলো দেখিতে না দেখিতেই প্রচন্ড বিস্ফোরন ঘটিয়া যায়। ঘটনাটি অনেক দিনের সংবাদ পত্রে এই বিষয়ে বেশ আলোচনা হয়। বৈজ্ঞানিকগন রুহ বা আত্মাকে একটি আলোক রশ্মি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। এই আলোক রশ্মিই যে জেনারেটরের মত মানব দেহকে সচল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বাস্তব সত্য।''

বৎস ! নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, মৃত্যুর মাঝে দেহ বিনাশ হয়, কিন্তু রুহের বিনাস হয় না! কেয়ামতের পর মানুষকে আবার পুনরুত্থাপিত করা হইবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ মানুষের কাজকর্মের বিচার করিবেন।

মাটি, বাতাস, আগুন, পানি ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত দেহ পিঞ্জর মধ্যে রুহ নামক যে জিনিষটির অবস্থান হয়, সেই রুহই প্রকৃত জীবন। এই দূর্জয় বস্তুটির কোন মৃত্যু নাই।মানুষের আছে অনুভূতি, বোধ শক্তি, স্মৃতি শক্তি, কল্পনা, ধারনা, যুক্তি ও বিচার শক্তি। এই সব কিছুকে একত্রিত করিয়া সৃষ্টি হয় 'মন'। আর এই মনকে সর্বক্ষন কর্মক্ষম অবস্থায় রাখে 'রুহ নামক মহাশক্তিশালী অদৃশ্য শক্তি।

আল্লাহ বলেন, ''তোমরা র্নিজ্জীব ছিলে পরে তিনিই তোমাদ্দিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রতিগমন করিতে হইবে। তাই তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অবিশ্বাস করিবে। **(ছুরা বকর ২৮ আয়াত)**

বৎস। এই আয়াতে আল্লাহতালা মানবের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, ''যাহার কৃপায় তোমরা অস্তিত্বহীন র্নিজ্জীব অবস্থা

হইতে বর্তমান সজীব অবস্থায় উপনিত হইয়াছে, তিনিই আবার তোমাদের নিজ্জীব করিবেন এবং পুনরায় পুনরুজ্জীবন লাভ করিয়া তোমরা স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। মানবের ঐশী বিশ্বাস সম্বন্ধে এই আয়াত সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল ভাবে পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

বৎস! যেমন ভাবে আমি আজ আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য পথ চলিতেছি, জগতের সমস্ত মানুষেরই আমার মত বিদায় লইতে হইবে। ছাড়িতে হইবে এই সুন্দর সংসার, এই সুন্দর ভূবন।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, "মোমেনের আত্মার মৃত্যু নাই। তাহার মৃত্যুর ফলে, তাহার আত্মার জ্ঞান চলিয়া যায় না। কারণ তাহার আত্মার কোন মলিনতা নাই।"

এই সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন, "মৃত্তিকা ঈমানের স্থান ভক্ষন করিতে পারে না। বরং উহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উছিলা বা উপকরণ হয়। সে যে, তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, তাহার নিকট হইতে তাহা চলিয়া যাইবেন।'

আত্মা জগতের আশ্চার্য্য ঘটনা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মাঝখানে তাহার যাতায়াত, ব্যবহারিক ও জড় জগতের বিদ্যার দ্বারা তাহা অর্জন করা সম্ভব নহে। সেই কারণে সুফী ও আউলিয়াগন শুধু আত্মাকে উজ্জ্বল, পবিত্র, নির্মল এবং মার্জিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকেন।

বৎস! এইবার নিশ্চয়ই তুমি স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছ, 'মানুষ মরে না' শুধুমাত্র দেহত্যাগ করে এবং 'রূপ বদলায় মাত্র'। মুছাফির যদি কিছু মনে না কর, তবে আমাকে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে আমিও মানুষকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব।

বৎস! তোমার ইচ্ছা সত্যই পবিত্র। জানার এবং বোঝার স্পৃহা না থাকিলে কিছু জানা ও শিক্ষা করা যায় না, জ্ঞান বড় সাধনার ধন। তোমার মধ্যে জানার ইচ্ছা সত্যই প্রবল। আল্লাহ যেন তোমাকে জ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রশাখায় বিচরণ করার তৌফিক দান করেন।

বৎস! তাহা হইলে শোন, ছুরা আল ইমরাণের ১৬৮ ও ১৬৯ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে স্বীয় জীবন হইতে মৃত্যুকে অতিক্রম কর। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা মৃত বলিয়া ধারনা করিও না বরং তাহারা জীবিত।" এই ছুরার ৯ আয়াতে বলা হইয়াছে "যাহারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহারা বলিয়াছেন, "হে আমাদের

প্রতিপালক নিশ্চয়ই তুমি সকল মানুষকে সেইদিন সমবেত করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নহেন।"

বৎস! এই আয়াতে কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ বলিয়াছেন, শুধু মাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে, এবং উদঘাটন করিতে পারিবে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করিয়া বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সৃষ্টির গোপন রহস্য জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া হইয়াছেন দার্শনিক। আল্লাহ তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত কিছুর মধ্যে জ্ঞান ছুড়াইয়া রাখিয়াছেন, যাহার জ্ঞান শক্তি বেশী যাহার ইচ্ছা শক্তি প্রবল, সেই কেবল উহা কুড়াইয়া লইতে পারে।

বৎস! আল্লাহপাকের কথা নিশ্চই তোমার ভাল লাগিতেছে, তবে শোন, ছুরা ইউনুছ এর ২, ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, মানবদের সর্তক কর এবং সু-সংবাদ দেও মোমেনদের, তাহাদের জন্য স্বীয় প্রভুর কাছে রহিয়াছে উচ্চপদ।" "আল্লাহর কাছেই তোমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; তিনিই সূচনা করিয়াছেন সৃষ্টি জগতের, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে ঈমানদার ও নেককারদিগকে কর্মফল দিতে পারেন সঠিকভাবে। আর যাহারা কাফের তাহাদের জন্য রহিয়াছে উষ্ণ পানীয়, ব্যাথাদায়ক শাস্তি, তাহাদের কুফুরির কারণে। তিনিই সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন উজ্জল রূপে, জানিয়া রাখিও তোমাদের নিকট রহিয়াছে এই পৃথিবীর ক্ষনস্থায়ী আবাসভূমি, আর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে আল্লাহর নিকটে। আলাহর দরবারে সকল মানুষকেই হাজির হইতে হইবে, ইহা হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না।"

বৎস! ছুরা হুদ এর ৪, ৭ ও ২৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং করিয়াছে সৎকার্য্য আর নিজেদের রব্বের নিকট বিনয়াবনত, তাহারাই হইবে বেহেশতী, থাকিবে সেথায় চিরকাল। আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে, আর তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তোমাদের পূর্নবার উঠানো হইবে মৃত্যুর পরে।"

সুরা ইব্রাহিমের ৪৮, ৪৯ ৫০, ৫১ ও ৫২ আয়াতে আল্লাহ বলিযাছেন, "সেই দিন এই পৃথিবী বদলাইয়া অন্য পৃথিবী হইবে, আকাশ ও মানুষ হাজির হইবে এক পরাক্রান্তশালী আল্লাহর সদনে। দেখিবে সেদিন অপরাধীগণের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। জামা-কাপড় হইবে ওদের আলকাতরার, ওদের মুখমন্ডল হইবে অগ্নিঢাকা, এই জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেককে দিবেন কৃত কর্মের ফল, হিসাব গ্রহনে আল্লাহ খুবই ত্বরিৎ। ইহা পৃথিবীর মানুষের জন্য এক জরুরী বার্তা, যাহাতে তাহারা অবগত হয়, হুশিয়ার ও সাবধান হয়।

বৎস! হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, ''পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবন খুবই ক্ষনস্থায়ী মাত্র। জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন খেলা তামাসা, সৌর্ন্দয্য প্রর্দশন, তোমাদের পরস্পরের ভিতর প্রতিযোগীতা এবং ধন ও জনের বৃদ্ধি, এই সকল তোমাদের জন্য মন্দ।''

আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছুফীদের ভিতর যাহারা উচ্চ সংযমের অধিকারী, আনন্দের সময় তাহারা তাহাদের হৃদয়কে সংসারের ধন সম্পদ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তখন হৃদয় কঠিন, ঘৃনিত এবং জঘন্য হয়, আল্লাহর জিকির ও আখেরাতের ফলাফল হইতে দূরে সরিয়া যায়। তাহারা দুঃখের সময় তাহাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তখন হৃদয় কোমল হয়, দয়ালু হয়, নির্মল হয় এবং আল্লাহর জিকিরের প্রভাবে দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত হয়। তাহারা দেখিয়াছেন, দুঃখের সময় নাজাত পাওয়া যায় এবং স্ফূর্তি ও ধন সম্পদের ভিতর থাকিলে আল্লাহ হইতে দুরে সরিয়া যাওয়ার কারন হয়। চক্ষু ও কর্ণকে অন্যান্য লোভনীয় বস্তু হইতে বিরত রাখিলে এবং আল্লাহর জিকির ও প্রশংসা কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, তখন দুনিয়ার সুখ ও সম্পদের এবং লোভের পরিবর্ত্তে আল্লাহর প্রীতি হৃদয়ে প্রবল হয়। আল্লাহর জিকির মানুষের সাথে কবরে যাইবে, ইহার কোন বিচ্ছেদ নাই।''

বৎস! আল্লাহ বলিয়াছেন, ''আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত হানি। ফলে উহা মিথ্যাকে চুর্নবিচুর্ন করিয়া দেয়। সূরা ২১ঃ ১৮ যেমন ন্যায় বিচার, সৎ ব্যবহার, সৎগুন ও নৈতিকতাবোধ এবং কর্মউদ্দীপনা মানুষের উন্নতি সাধন করে। তেমনি অহংকার, অবিচার, অত্যাচার, দূর্নীতি, ভোগবিলাস মানুষের জীবনে ধ্বংস ডাকিয়া আনে। এই ধ্বংস ধীরে ধীরে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে, পৃথিবীর অতীত, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য।

আচ্ছা মুসাফির আল্লাহ কিভাবে অস্তিত্বহীন মৃত জীবকে পূনরুজ্জীবন দান করিবেন?

বৎস! হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর নিকট ঠিক অনুরূপ বিষয়ই জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা বকর ২৬০ আয়াতে দান করিয়াছেন। ঐ আয়াতটিকেই আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব, তবে শোন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করিতেন যে, তিনিই (আল্লাহ) জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক এবং বিচার দিবসে সকলেই পূনরুজ্জীবিত হইবে। কিন্তু আল্লাহ কিরূপে অস্তিত্বহীন মৃত জীবকে পূনরুজ্জীবন দান করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য তাহার সাধ হয়। এই জন্য তিনি একদিন

আল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, প্রভু! তুমি কেমন করিয়া মৃত্যুকে পুনরুজ্জীবন দান করিবে? তাহা আমাকে দেখাও। তখন আল্লাহ বলিলেন, তবে চারিটি পাখী গ্রহন কর এবং তাহাদের কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় রাখিয়া দাও এবং নির্দিষ্ট স্থান হইতে তাহাদের আহব্বান কর। হযরত ইব্রাহিম তাহাই করিলেন। পরে পাখীদের একটি একটি করিয়া ডাকার সাথে সাথে প্রত্যেক পাখীই জীবন্ত হইয়া হাজির হইল। আল্লাহর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া হযরত ইব্রাহিমের ঈমান আরও সুদৃঢ় হইল এবং আল্লাহ বলিলেন, ''জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।''

বৎস! এখন মানব শরীর সর্ম্পকে কিছু বৈজ্ঞানিক ত্বত্ত্ব শোন, তোমার বসবাসের ঘরে বৈদ্যুতিক আলো আছে। ঘরে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো আছে, সেইটাই জ্বলে। যখন সুইচ বন্দ করিয়া দেওয়া হয়, তখন কি ঐ বাল্ব জ্বলিবে? নিশ্চয়ই জ্বলিবেনা। তাহা হইলে সুইচ বন্দ থাকিলে বিদ্যুৎ কোথায় যায়? বিদ্যুৎ হয় লাইনে থাকে, না হয় পাওয়ার হাউজে চলিয়া যায়। আর পাওয়ার হাউস যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদ্যুৎ কোথায় যায়? তখন বিদ্যুৎ অনন্ত পৃথিবীর আল্লাহর মহা শক্তির সাথে একাকার হইয়া যায়। পৃথিবীর পানি হইতে বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, সুর্যের হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন এবং বিভিন্ন গ্যাস হইতে মাটির সাহায্যেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

মানব শরীর মাটি, পানি, বাতাস, আগুন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দিয়া গঠিত। তাহাতে আল্লাহ রুহ দান করিয়াছেন। ইঞ্জিল কেতাব বা বাইবেলে গড্ বলেন, ''হইয়া যাও, আর আলোকিত হইয়া গেল।'' কোরআন পাকে বলা হইয়াছে, ''কুন, ফাইয়া কুন''। ঐ আলো বা লাইটই হইল আত্মা।

মানব শরীরে বৈদ্যুতিক তারের মত বা বৈদ্যুতিক লাইনের মত আছে ধমনী, আছে শিরা ও উপশিরা। আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের দেহ পিঞ্জরে সৃষ্ট রক্ত, ঐ সকল ধমনী, শিরা ও উপশিরায় প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায়ই মানব শরীরে সৃষ্টি হয়, বিদ্যুতের খেলা।

জার্মান বৈজ্ঞানিকগন রুহ বা আত্মাকে আলোর রশ্মি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। এবং তাহা জেনারেটরের মত মানব শরীরকে সচল করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই বাস্তব সত্য।

বৈজ্ঞানিকগন বিদ্যুতের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, দুই প্রকারে যেমন (১) সমধর্মী বিদ্যুৎ, যাহা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং (২) বিপরীত ধর্মী বিদ্যুৎ, যাহা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মানব শরীরের পরমানুতে বিপরীত ধর্মী বিদ্যুৎ

আছে, এবং ইলেকট্রন ও প্রটন বা পজেটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ সমপরিমানে আছে। মানব শরীরের পরমানুর যে অংশ হইতে ইলেট্রন সড়াইয়া নেওয়া হয়, সেই অংশে পজেটিভ বা ধনচার্জ হয়। ইহার একটি উদাহরণ স্বরূপ চীনে মানব শরীরে রহস্যজনক আগুন'' এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘটনাটি হইল, দৈনিক ইত্তেফাক ১২২তম সংখ্যা, ২রা মে ১৯৯০, ১৮ই বৈশাখ ১৩৯৭ বুধবার শেষ পাতার ২ এর কলামে ''মানব দেহে রহস্যজনক আগুন শিরোনামে বলা হইয়াছে, বেইজিং হইতে রয়টারঃ–''চীনের চিকিৎসকরা মানব দেহের নূতন এক রহস্যময় রোগ নিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় হুনান প্রদেশে চার বছরের ছেলে তুঙতাং জিয়াং। তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশে আপনা আপনি আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই ধিকি ধিকি আগুনে তাহার ডান হাত, বাহুমুল ও গোপনাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। ''চায়না ইউথ নিউজ পত্রিকায় চীনা ডাক্তারদের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয়, বালক তুঙ এর শরীরে শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ কায্যকর রহিয়াছে। তাহার শরীরের একস্থানে দুইস্তর কাপড় ও এক ইঞ্চি পরিমান জায়গা পুড়িয়া যায়। সপ্তাহ দুই আগে তুঙ এর ট্রাউজারের ভিতর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে দেখেন। হাসপাতালে নেওযার ৫০ মিনিটের মধ্যে তুঙ এর শরীর হইতে পুনরায় ধোয়া বাহির হইতে শুরু করে। হাসপাতালে দুই ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ চারবার তুঙ এর শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠে। ইতিপূর্বে বিশ্বের অন্যস্থানে এই ধরনের রোগের কথা শোনা গেলেও চীনে এই প্রথম।''

মানব শরীরের কোন অংশে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘাটতি হইলে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া সেই অংশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পুরন করার যে চিকিৎসা পদ্ধতি তাহার নাম আকুপাঞ্চার। ''মুছাফির'। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সর্ম্পকে বিস্তারিত বিষয়াদি সর্ম্পকে দয়া করিয়া কিছু শুনাও। বৎস! তবে শোন বর্তমান বিশ্বে ইহা এক নূতন আবিষ্কার।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ই বৈশাখ ১৩৯৭ সাল, বুধবার, ৩ এর পাতায় ''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির সমন্বয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দুর করা সম্ভব'' শিরোনামে নাজিম উদ্দিন মোস্তান, এক নিবন্ধে লিখিয়াছেন,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসা শাস্ত্র রোগ শোক নিরাময়ে কেমন করিয়া কাজ করে, ইহা জানিবার আগ্রহ সার্বজনীন। আমেরিকার র্জানাল অব আকুপাঞ্চারে হনলুলুর খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী সাইরাস ডব্লু এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, পাশ্চাত্যের চিকিৎসা দেহগত অস্তিত্বে জরাদুর করিতে চায়, প্রাচ্যের চিকিৎসা কাজ করে চৈতন্যের গভীরে। একটির ক্রিয়াক্ষেত্র বহিরাঙ্গ, অন্যটির ক্রিয়া ক্ষেত্র অর্ন্তগত সত্ত্বা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসা ধারা

নিরাময়ের পন্থা সন্ধান করিতে গিয়া মানুষের অস্তিত্বের কায়িক ও অবচেতন উপলব্ধির জগতকে আবিষ্কার করিয়াছে।

কোরিয়া, জাপান ও মার্কিন সামরিক হাসপাতালে দায়িত্ব পালনকারী উচ্চমানের শল্যবিদ ও চিকিৎসাবিদ, সাইরাস লু গত ১৩ বৎসরে ৭০ হাজার রোগীকে আকুপাংচার দ্বারা নিরাময় করিতে গিয়া দুই চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্ম উদঘাটনকরিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, ''প্রাকৃতিক রাজ্যে পরস্পর বিরোধী দ্বৈত শক্তির মত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যেও দুই শক্তি ক্রিয়াশীল। চীনারা এই দুই শক্তিকে ইন ও ইয়ং বলিয়া সনাক্ত করে। দেহ ও মনের অস্তিত্বে এই দুই শক্তির ভারসাম্য থাকিলেই প্রফুল্ল, স্বাস্থ্যকর ও জীবনানন্দে মানুষ দিন কাটায়। এই দুই শক্তির মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, অসঙ্গতি দেখা দিলেই সৃষ্টি হয়, অসুখ ও অসুস্থ্যতা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা দৃশ্যমান রোগ বালাই এর চিকিৎসা করে। পক্ষান্তরে আকুপাংচার অদৃশ্য অনুভবের কষ্টবোধকে উপশম করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসায় বুদ্ধি বৃত্তি ও যুক্তির চেতন মন নির্ভর। কিন্তু প্রাচ্য চিকিৎসা অন্তলোকের সজাগ অনুভূতির অবচেতন রাজ্যে পৌঁছিয়া নিরাময়ের সূত্র অন্বেষণ করে। এই দুই এর পার্থক্য বুঝিতে হইলে ইহা অনুভব করাই যথেষ্ট যে, বিষয়গত মনের ক্রিয়া হইতেছে, ''যুক্তি নির্ভর মানস,'' আর অর্ন্তলোকের ক্রিয়া হইতেছে চৈতন্যগত মানস।''

মুসাফির। এই আকুপাংচার কিভাবে কাজ করে? বৎস। মানুষের দেহে বহমান তড়িৎ এর উৎসারণ ও বহমানতাই আকুপাংচারের বিবেচ্য বিষয়। স্নায়ুবিক ধমনী বাহিয়া তড়িৎ এর আকারে স্নায়ুবিক তরঙ্গাভিঘাত প্রেরণ, তড়িৎ এর উৎসারন দ্বারা কোন কোষকলা বা অঙ্গের কার্যক্রমকে স্বাভাবিক করিয়া তোলাই এই চিকিৎসারলক্ষ্য।

আকুপাংচার মানবদেহের তড়িৎ ব্যবস্থাকে সমস্যা বা অসুবিধার স্থানে কিম্বা ইহার আশে পাশের স্নায়ুতন্ত্রকে ভারসাম্যকর করিয়া তোলে। যখন মানবদেহে জীবনী শক্তি, চী নামক বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ কোন কারনে ব্যাহত কিম্বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে রোগী অসুখের আলামত অনুভব করিতে শুরু করে। বুকের বা হৃদ পিন্ডের মধ্য দিয়া যদি অত্যাধিক তড়িৎ বহিতে শুরু করে, তাহা হইলে বুক ধরফর, স্নায়ুবিক অস্থিরতা, অনিদ্রার মত হাইপাটেনশন এর উদ্রেক ঘটে।

বুকের মধ্যদিয়া কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে রোগী নির্জীব, ধীর গতি, বুকে শক্তি না পাওয়ার মত নিস্পন্দন হইয়া পড়ে।

কোন রোগের কারণে স্নায়ুতন্ত্র ছিন্ন হইয়া বা রুদ্ধ হইয়া তড়িৎ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ রুদ্ধ হইলে তড়িৎ এর তরঙ্গাভিঘাত না পাইয়া মাংসপেশী অকেজো হইয়া পড়ে। দৃশ্যতঃ শরীরের কোন অংশ ইহার ফলে অবশ হইয়া পড়ে। এই ধরণের পঙ্গুত্ব ঘটিয়া গেলে, আকুপাংচার কাজ করে না। আকুপাংচার কাজ করিবে, ইহার পূর্বশর্ত হইল, তড়িৎ ধারা বহিয়া লইবার স্নায়ুতন্ত্র নিখুঁত থাকিতে হইবে। আর অনেক সময় দেহের অভ্যন্তরে কোন এক দিকে তড়িৎ শক্তি, পুঞ্জিভূত হইয়া আটকা পড়ে। ইহার ফলে, শরীরের অংশ বিশেষে ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হয়। বাতের ব্যাথা, হাঁটুর বা কনুই এর ব্যথা, বন্দুকের গুলির জখম সারিবার পরবর্তী ব্যথা, পেশীর ব্যথা ইহার অন্তর্গত। এ ধরনের ক্ষেত্রে আকুপাংচার অব্যর্থ। কষ্টের স্থানটিতে একটি সূঁচ বিদ্ধ করিয়া পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ শক্তিকে চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়।

চীনের এই চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমানে জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান ও কোরিয়া গ্রহন করিয়া প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের দ্বৈত চিকিৎসার ধারা সমন্বিত করিয়াছে।"

বৎস! তাহা হইলে এখন আর কোন সন্দেহ থাকার কথা নহে যে, মানব শরীরে বিদ্যুৎ আছে, এবং এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হইলে শরীর অসুস্থ্য হইয়া পড়ে মানব শরীরের এই বিদ্যুৎ আল্লাহর সৃষ্টি ইহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। মানুষের শরীরে হৃদপিন্ড বা হার্ট আছে। এই হার্টে দুইটি ভাল্ব আছে। এই ভাল্ব আল্লাহর দেওয়া শরীরের বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। মানব শরীরের এই বিদ্যুতের ঝংকারই মানুষের অনুভূতির সূচনা করে। রক্তের সাথে আল্লাহর সৃষ্ট এই বিদ্যুৎ প্রবাহই অদৃশ্য মৌলিক পদার্থ। এই বিদ্যুৎ শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে, ঐ ভাল্ব আর চলেনা। তখন দেহের কোন মূল্য থাকেনা। এই বিদ্যুতের উৎপত্তিস্থল মানব শরীরের হার্ট। এই অদৃশ্য অত্যন্ত শক্তিশালী প্রবাহ আল্লাহর হুকুমে মানব শরীরে আসিয়াছে। আসলে ইহাই রুহ বা আত্মা বা নিরাকার 'লতিফা'। ইহা আল্লাহর নির্দেশেই মানব শরীর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায় এবং আল্লাহর মহা শক্তির সাথে একাকার হইয়া যায়। সমস্ত বিদ্যুতের উৎপত্তিস্থল আল্লাহর মহা শক্তি হইতে।

বৈজ্ঞানিকরা বলিয়াছেন, আত্মা একটি শক্তিশালী আলো বা লাইট। জার্মান বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন ঐ শক্তিশালী আলো কিছুটা 'নীলাভ'।

বৎস! সূরা 'হিজ্বর' এর ২৯ আয়াতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আমি যখন আদমের আকৃতি সুঠাম করিব, এবং তাহাতে আমার রুহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহাকে 'সিজদা' করিও। তখন ফেরেস্তাগণ সবাই

সিজদা করিল; করিল না শুধু ইবলিস বা শয়তান। আল্লাহ বলেন, তবে এখান হইতে বাহির হইয়া যাও। ইবলিস বা শয়তান অহংকার করিয়া চির অভিশপ্ত হইল।''

বৎস! আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, ''আল্লাহ মহাশক্তিশালী, আল্লাহ জ্যেতিময়, আল্লাহ মহা পরাক্রান্তশালী, আল্লাহ মহা বৈজ্ঞানিক, আল্লাহ মহা বিচারক।

বৎস! আল্লাহর সেই মহা শক্তির, সেই মহা জ্যোতি বা নুরের সামান্য 'চ্ছটা' বা রশ্মিই হইল মানব আত্মা বা রুহ, আল্লাহর সেই নুর বা আলো বা জ্যোতিই মানুষের জ্ঞান। আল্লাহর জিকির দ্বারা, সৎকার্য্য দ্বারা এই জ্যোতিকে শক্তিশালী করিয়া আল্লাহর সাথে, আল্লাহর নবীর সাথে, অলি আউলিয়া ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ করা যায়, যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং নিমিষে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ মন্ডল পরিভ্রমন করা যায়।

বৎস! বাহিরের বিদ্যুতের সাহায্যে ফ্যান ঘোরে, লাইট জ্বলে এবং ইঞ্জিন চলে, কিনতু বিদ্যুৎ শক্তি দেখা যায় না কিন্তু ইহার কার্য্য ক্ষমতা অনুভব করা যায় মাত্র। তেমনিভাবে মানুষের শরীরের বিদ্যুৎ প্রবাহ বা প্রাণ প্রবাহ দেখা যায় না, কিন্তু ইহার ক্রিয়াক্ষেত্র বিচরন ক্ষেত্র সমগ্র শরীর এবং ইহাই শরীরকে প্রাণবনত রাখে, সুস্থ্য রাখে, আলোকিত করে।

বৎস! তুমি কি জাগ্রত না ঘুমন্ত? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা! বৎস! আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করুন। তোমার হৃদয়ে আল্লাহ প্রেম জাগ্রত হোউক, এবার তাহা হইলে আমি আসি। না – না – না ------মুসাফির আর একটু দাঁড়াও! মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের পন্থা সম্পর্কে আরও কিছু শুনাও, নইলে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্ত মহাশক্তিমানের কাছে রওয়ানা হইব।

বৎস! আমার সঙ্গে তোমার যাওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহর সেই মহাশক্তির সামান্য জ্যোতি বা আলো বা বিদ্যুৎ শক্তি, যাহার দ্বারা পৃথিবী সঞ্জীবিত যাহাই বলনা কেন, উহার গতিবেগ হয়তো বিজ্ঞানে পড়িয়াছ। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তেমনি আমার আত্মা বা রুহ এখন প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যাইতে পারিবে। বৎস! তুমি আল্লাহর জিকির কর, তোমার রুহানি শক্তি বৃদ্ধি কর, তবেই পারিবে অসাধ্যসাধনকরিতে।

বৎস! শোন, ''মানুষের মধ্যে পরম করুনাময় আল্লাহ যে জ্যোতি বা আলো বা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়াছেন, সমগ্র আকাশে বাতাসে সেই জ্যোতি বা আলো বা বিদ্যুৎ সবই আছে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এবং আকাশের ও মহাকাশের সমস্ত কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।

বৎস! পবিত্র কোরআনের সুরা বকর এর ২৯ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি আকাশের দিকে মননিবেশ করিলেন এবং সপ্ত আকাশ সুবিন্যাস্ত করিলেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী ও মহা বৈজ্ঞানিক। এই আয়াতে পৃথিবীর মাটি, পানি, আগুন, বাতাস, গ্যাস এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও সপ্ত আকাশের স্থিতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। বৎস! আল্লাহ চন্দ্র, সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা আলো ও তাপ পাইয়া থাক আল্লাহ মাটি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা খনিজ পদার্থ ও ফসল পাও। আল্লাহ আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে বৃষ্টি বর্ষন করিলে, তোমরা পানি পাও। আল্লাহ দুই ধরনের বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন (১) রহমতের বাতাস, যাহা তোমাদিগকে বেহেস্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং (২) আজাবের বাতাস, যাহা তোমরা সহ্য করিতে পারনা, যাহা তোমাদের ক্ষতি করে, ঘর বাড়ী ভাঙ্গাচুর করে এবং তাহা তোমাদের দোজখের কথা স্মরন করাইয়া দেয়। বৎস! এ দোজকের বাতাস শয়তানেরঅনুসারীদেরজন্য।

বৎস! তুমি অনেক লেখাপড়া করিয়াছ, অনেক জ্ঞানী, কারণ তুমি আজকের বিজ্ঞানের যুগের মানুষ, বিজ্ঞান ছাড়া, প্রমান ছাড়া, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, তবে শোন, আল্লাহ যে বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে আছে বিভিন্ন রকম গ্যাস, ধুলিকনা ও পানির কনা। ইহারা সব সময় বাতাসের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় পানির কনা–পানির কণার সাথে ধুলিকণা, ধুলির কণার সাথে ধাক্কা খায় বা ঘষা লাগে এবং অনেক সময় গ্যাসের অনুর ঘষাও লাগে, ফলে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি পানির কনায় খুব সামান্য পরিমান বিদ্যুৎ জমা হয় এবং মেঘ তৈয়ারী হয় কোটি কোটি পানির কনা মিলিয়া। তাই মেঘে বিদ্যুতের পরিমান অনেক বেশী। ঝড়ের সময় বাতাস খুব জোরে এলো মেলো ভাবে প্রবাহিত হয়, ফলে মেঘে মেঘে ঘর্ষন লাগিয়ে প্রচুর বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। এই সময় মেঘে বিদ্যুতের পরিমান এত বেশী বাড়িয়া যায় যে, বিদ্যুৎ এক মেঘ হইতে আর এক মেঘে অথবা মেঘের একাংশ হইতে আর এক অংশে লাফাইয়া চলিয়া যায়, ফলে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং আলোর ঝলকানি দেখা যায়, আলোর এই ঝলকানিকে বিদ্যুৎ চমকানি বলে। এই সময় যে শব্দের

সৃষ্টি হয়, তাহাকে বলা হয় বজ্রনাদ। বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রনাদ একই সময়ে ঘটে, কিন্তু শব্দের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চাইতে অনেক কম, তাই বজ্রনাদ শোনা যায় আলোর ঝলক দেখার অনেক পরে।'' পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ শুধু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য হইতে আবিষ্কারের নেশায় মাতিয়া আছেন তাহারা। আল্লাহর ন্যায় কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন নাই কোন দিন পারিবেনও না। বরং আল্লাহর সৃষ্ট অনেক কিছু আজও পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ উদঘাটন করিতে পারেন নাই। তাই পাগল প্রায় হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধানে লিপ্ত আছেন। আকাশের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট অনেক বিষয় এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

জগতের সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করা হইয়াছে, আল্লাহর নূর বা আলো দ্বারা। বৎস! আল্লাহ কত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই পৃথিবী, সৃষ্টি করিয়াছেন কত জীব, কিন্তু সব কিছুর উপরই আল্লাহ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। কারণ মানুষকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়াছেন, তাহা অন্য কোন বস্তু বা প্রাণীকে দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ বড়ই রসিক, বড়ই সৌন্দর্য্য প্রিয়, বড় তামাসা কারক আবার বড়ই দয়ালু এবং বড়ই কঠোর। কারণ এত সুন্দর করিয়া আল্লাহ পৃথিবী সাজাইয়া মানুষকে করিয়াছন মুসাফির, দিয়াছেন ক্ষনস্থায়ী জীবন। পৃথিবীর মায়া মমতা ভুলে যাওয়া বড় কঠিন। অবুঝ মানব সন্তান বুঝিতে পারেনা যে, হায়! অনন্ত জীবনের তুলনায় ইহলোকে প্রত্যেক জীবনই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষনস্থায়ী। সুতরাং স্বলল্প সময়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করা যায়, তাহাতে অন্য জীবন লাভ হয়। কারণ আল্লাহ :লিয়াছেন, ''যাহারা পার্থিব ধন সম্পদে সন্তুষ্ট ও শান্তি লাভ করে, তাহা তাহাদের জন্য বিষ তুল্য। সুতরাং মানুষের পার্থিব ধন সম্পদ অধিকারে থাকিলে মনে যে আনন্দ জন্মে, যে বিলাসিতা জন্মে তাহা ত্যাগ করা উচিৎ। তেমনি ভাবে ঈমানকে মজবুত করিতে হইলে যশ, প্রবৃত্তি, লোভ ও ভোগ ত্যাগ করা উচিৎ। কারণ এই গুলিই হইল ঈমানের শত্রু।

অনন্তকাল মানুষ কোথায় কিভাবে বাস করিবে, তাহা অবুঝ মানুষ একবারও চিন্তা করেনা, পৃথিবীর হাসি কান্না বোঝেনা যে, কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় অনন্তকাল বাস করিতে হইবে? এতদ্বসম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; বর্ণিত আছে যে, মহাত্মা ইব্রাহিম ইবনে আদহাম জনমানব শূন্য এক প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একজন সিপাহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সিপাহী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ''তুমি কি গোলাম? তিনি জবাব দিলেন হাঁ আমি গোলাম। সিপাহী বলিল লোকালয় কোথায় আছে বলিতে পার? মহাত্মা ইব্রাহিম গোরস্থানের দিকে দেখাইয়া দিলেন। তখন সিপাহী বলিল, ''আমি

লোকালয় খুজিতেছি।'' তিনি জবাব দিলেন ''গোরস্থানই স্থায়ী বসবাসের স্থান।'' ইহা শ্রবন করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সিপাহী তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল এবং বাঁধিয়া শহরে লইয়া গেল। তখন তাঁহার মুরিদগন তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সিপাহী সকল কথা প্রকাশ করেন। তখন তাহারা বলিলেন, ''এই মহাত্মার নাম ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। তিনি আল্লাহর ওলী। তখন সিপাহী তাহার ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনি কেন বলিয়াছেন আমি গোলাম?'' উত্তরে তিনি বলেন, ''সিপাহী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তুমি কি গোলাম? উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ আমি গোলাম। কারণ আমিতো আল্লাহর গোলামই বটে। যখন সে আমার মস্তকে বেত্রাঘাত করে, তখন আমি আল্লাহর নিকট তাহার জন্য বেহেস্তের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কারণ আমি অবগত আছি যে, তাহার নিকট হইতে আমি যে অত্যাচার পাইয়াছি, তজ্জন্য আমি পূণ্য পাইব। আর যাহার জন্য আমার পূণ্য হইল সে আমার পাপের ভাগি হইয়া থাকিবে, আমি তাহা ভালবাসিনা।''

বৎস! হযরত ছহল ইবনে আব্দুল্লা তশতরী বলিয়াছেন, ''আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, (আল্লাহ মাইন), আল্লাহ আমার নিকটে আছেন, (আল্লাহ হাদেরী), আলাহ আমাকে দেখিতেছেন, (আল্লাহনাজেরী)।''

আল্লাহ যাহার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ যাহার নিকটে আছেন, আল্লাহ যাহাকে দেখিতেছেন, তিনি কেমন করিয়া আল্লাহকে বুঝিতে পারেন না, চিনিতে পারেন না বা জানিতে পারেন না।''

বৎস! আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান চক্ষু দিয়া তোমার নিজের শরীর দেখ, আকাশ দেখ, মাটি দেখ, দেখ মহাকাশ, জ্ঞানীরা কি অনুসন্ধান করেন, তাহাও দেখ, তবেই তুমি আল্লাহকে দেখিতে পাইবে, জানিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, অনুভব করিতপরিবে।

বৎস! তুমি আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন না হইলে, আল্লাহর সাথে তোমার বা আল্লাহর রসুলের সাথে, তোমার কোন যোগসূত্র স্থাপন হইবে না।

আল্লাহর হুকুম পালন করিলে, আল্লাহর যিকির করিলে, সৎকর্ম করিলে, মানুষের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলে, তোমার মধ্যে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি হইবে; তোমার আত্মার কালিমা দুর হইয়া আয়নার ন্যায় সচ্ছ হইবে, আর তখনই তুমি আল্লাহকে চিনিতে পারিবে, আল্লাহকে দেখিতে পারিবে। তদ্রুপভাবে আল্লাহর নবীকেও জানিতে, বুঝিতে ও দেখিতে পারিবে এবং পারিবে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে।

আল্লাহ বলেন, মোমেন বান্দার মৃত্যু নাই, শহীদগনের মৃত্যু নাই, তাহাদের তোমরা মৃত ভাবিও না। মোমেনের মৃত্যুকালে তাহার আত্মার জ্ঞান চলিয়া যায় না। তাহার আত্মা মলিন হয় না, সর্বদা সচ্ছ দর্পনের মত থাকে। সুরা বকর এর ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''যাঁহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে মৃত বলিও না। বরং তাহারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তাহা অবগত নহ।'' সুরা ইমরান এর ১৬৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''তোমরা স্বীয় জীবন হইতে মৃত্যুকে অতিক্রম কর।''

বৎস! পাপ কার্য্যে লিপ্ত মানুষের আত্মার মৃত্যু হয়। আর সৎ কার্য্যের দ্বারা আত্মা প্রানবন্ত হয়, সজীব হয়, আত্মার জ্ঞান শক্তি ও ক্ষমতা শতগুনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জানিও সৎ কার্য্য এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি তোমার দয়া ও কমলতা এবাদতের মধ্যে গন্য হইবে। তাহা কখনও মূল্যহীন বা বৃথা যাইবেনা। হযরত হাসান বসরী (রঃ) উপরোক্ত বিষয়ের উপর ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন, ''মৃত্তিকা ঈমানের স্থান ভক্ষন করিতে পারেনা। বরং উহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উছিলা বা উপকরন হয়। সে যে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করে, তাহার নিকট হইতে তাহা চলিয়া যাইবেনা।'' মোমেনের আত্মা সংরক্ষিত থাকে, যত্নে সংরক্ষিত একটি দর্পনের ন্যায় এবং বিভিন্ন আকৃতি তাহার উপর প্রতিফলিত হইবে,একটি আকৃতির পর আর একটি আকৃতি ক্রমাগতভাবে তাহার উপর প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। বৎস! তুমি তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৎকার্য্যই হোউক আর পাপ কার্য্যই হোউক, যাহাই করনা কেন, তাহার প্রভাব তোমার আত্মার ঐ সচ্ছ দর্পনের উপরেপড়িবে।

বৎস! ভাল কাজ করিলে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করিলে আত্মা নির্মল হয়, স্বচ্ছ আয়নার মত হয়, আর পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে আত্মায় ক্রমাগত ভাবে ময়লা পড়িতে থাকিবে, আত্মা মলিন হইতে থাকিবে, আত্মার মূল্যবান মহাশক্তি বিলীন হইয়া আত্মা দূর্বল হইয়া পড়িবে, এবং পরিশেষে ঐ আত্মায় আর আয়নার মত ছবি দেখা যাইবে না। কলুষিত আত্মা আল্লাহকে ভুলিয়া যায় আর তেমনি ভাবে ভুলিয়া যায় আল্লাহর নবীর আদর্শকে। সেই আত্মা বঞ্চিত হয়, আল্লাহ ও তাঁহার নবীর প্রেম শান্তি হইতে।

যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''আমি তাহাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর এবং পশ্চাতে একটি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। তৎপর আমি তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে তাহারা দেখিতেনাপায়।''

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, "এলমে মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞান একটি জ্যোতি এবং সেই জ্যেতির সাহায্য ব্যতীত মোমেনগণ আল্লাহর সহিত দীদার লাভ করিতে পারে না।" আল্লাহ বলেন, "সেই জ্যোতি বা নূর তাঁহাদের সামনে ও পার্শে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এইরূপ সুখের আয়োজন রাখিয়াছি, কোন চোখ তাহা দেখে নাই, কোন কান তাহা শোনে নাই, এবং কোন মানসপটে সেই সুখের কল্পনা কখনও উদ্ভাসিত হয়নাই।

(বুখারী শরীফ ও মুসলীম)

বৎস! পৃথিবীর জলে স্থলে, মাটির নীচে, আকাশে ও মহাকাশে যত উৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্তু, সম্পদ বৃক্ষাদি, তরুলতা জীব জন্তু ও ধন সম্পদ আছে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ।

পবিত্র কোরআনের সূরা বকর এর ২৬৮ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে, এবং তোমাদিগকে অসৎ বিষয়ের প্রতি আদেশ করে, আর আল্লাহ তোমাদিগেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের অঙ্গিকার করেন। কারণ আল্লাহ উদার ও মহাজ্ঞানী।

বৎস! আল্লাহ তোমাকে যে ক্ষুদ্র বা সামান্য ধন সম্পদ যাহাই দিয়াছেন, তাহা জ্ঞান থাকিতে বা চক্ষু থাকিতে অসৎ কাজে ব্যয় করিও না। জানিও তোমার উপার্জনের অর্থ অত্যন্ত পবিত্র এবং উহার মধ্যে নিহিত আছে, আল্লাহর দেওয়া বরকত ও আল্লাহর সন্তষ্টি।

এই বিষয়ে আল্লাহ সুরা বকর এর ২৬৭ আয়াতে বলিয়াছেন, "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, আমি তাহা ভূমি হইতে উদগত করিয়াছি, সেই পবিত্র উপার্জ্জন হইতে ব্যয় কর এবং উহা হইতে এই রূপ কোন কলুষিত বা খারাপ কাজে ব্যয় করিবে না বা ঐরূপ কাজে ব্যয় করিতে মনস্থও করিও না। যতক্ষন তোমার জ্ঞান থাকে, যতক্ষন তোমার চক্ষু মুদ্রিত না হয়, ততক্ষন ঐরুপ কলুষিত বা পাপকার্য্যে তোমার উপার্জনের পবিত্র অর্থ ব্যয় করিবেনা। তোমরা আরও জানিয়া রাখ, তোমাদের আল্লাহ মহা সম্পদশালী ও অত্যন্তপ্রশংসিত।

বৎস! তুমি অত্যন্ত জ্ঞানী। জানিয়া রাখ তোমার ঐ জ্ঞান সর্বদা সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে। ঐ জ্ঞান দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

পার্থিব এই জগতে যাহারা আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাই তোমরা মর্য্যদা, মূল্য ও গুরুত্ব অর্ন্ত চক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জ্ঞানী ছাড়া কেহ জ্ঞানের মূল্য দিতে পারেনা, উপলব্ধিও করিতে পারিবে না। এতদ্বসর্ম্পকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের সুরা বকর এর ২৬৯ নং আয়াতেবলিয়াছেনঃ–

''আমি যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করি, এবং যাহাকে দান করি, সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে এবং জ্ঞানবান লোক ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা।''

বৎস! অনেকে পর নিন্দার ভয়ে অনেক কিছু গোপন করে। আবার অন্যায় লাভের দুরাশায় অনেক কিছু সত্য মিথ্যা প্রকাশ করিতে ভয় করে না। জানিয়া রাখ আল্লাহ সব কিছুই দেখিতে পারেন এবং তিনিই ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুরস্কার দিতে পারেন, তোমাদের শাস্তি দিতে পারেন এবং তোমাদের শাস্তি দেওয়া হইতে পরিত্রান দিতে পারেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা বকর এর ২৮৪ আয়াতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ''নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যাহা কিছু, আছে, তাহা আল্লাহরই, এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর বা উহা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট তৎবিষয়ে হিসাব গ্রহন করিবেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। জানিয়া রাখ আল্লাহসর্বশক্তিমান।

এই পৃথিবীতে তুমি যাহা অর্জন করিয়াছ, তাহা তোমারই জন্য এবং যাহা উপার্জন করিয়াছ তাহাও তোমারই জন্য। সুতরাং তোমাদের ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থি হও।

আল্লাহ সুরা বকর এর ২৮৬ আয়াতে বলিয়াছেন, ''আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না। কারণ যাহা সে উপার্জন করিয়াছে, তাহা তাহারই জন্য এবং যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহাও তাহারই জন্য।''

বৎস! যে ব্যক্তি উপার্জন করে, অর্জন করে, সে নিজের সুখের জন্য তাহা ব্যায় করিতে পারে। আর যে উপার্জন করিতে পারেনা অথচ প্রয়োজন অনেক, সে নিঃস্ব হইয়া যায়। তাহার জমি–জমা বাড়ী–ঘর শেষ পর্যন্ত নিলামে উঠে।

বৎস! জানিয়া রাখ আল্লাহ মানুষকে, মানুষের আত্মাকে জগতের আশ্চার্য্য ঘটনা হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আর সেই কারণেই হয়তো ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন, ''আল্লাহকে জানিতে হইলে নিজেকে জানা দরকার। আত্মা জগতের আশ্চার্য্য ঘটনা, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের মাঝে তাহার যাতয়াত, ব্যবহারিক ও

জড় জগতের বিদ্যার দ্বারা তাহা অর্জন করা সম্ভব নহে। আল্লাহর জিকির মানুষের সাথে কবরে যাইবে, ইহার কোন বিচ্ছেদ নাই।''

বৎস! ইহা কিন্তু এলমে মারেফাতের কথা, আমি তোমাকে বিজ্ঞান দিয়া একটু বুঝাইয়া দেই, শোন; পৃথিবীতে মানুষ যে কথা বলে, যে শব্দ সৃষ্টি করে, তাহাও কিন্তু ইথারে ভাসিয়া বেড়ায়। বৎস! তোমাদের ঘরে রেডিও আছে, টেলিভিশন আছে, ফোন আছে, অয়ারলেস আছে, এই সবই কিন্তু মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করিয়া। রেডিও সেন্টার হইতে পাঠকরা খবর আজ তোমরা ঘরে বসিয়া শুনিতে পাও কেমন ভাবে? চিন্তা কর টেলিভিশন সেন্টার হইতে মানুষ কথা বলে, আর তোমরা ঘরে বসিয়া যদি সেই মানুষের কথা শোন, টেলিভিশনের পর্দায় সেই মানুষের ছবি দেখ, ইহা কেমনভাবে সম্ভব হইল?

মানুষের কথা ইথারে ভাসিয়া বেড়ায়। আর যন্ত্র সেই কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরিতে সক্ষম হয়। বৎস! এইবার জবাব দাও, ''তাহা হইলে যিনি সমস্ত পৃথিবী, আকাশ বাতাস, জলস্থল, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মায়ের পেটের মধ্যে তোমাদের খাবার যোগাইয়াছেন, তোমার জন্ম হওয়ার পর আবার ভিন্ন ধরণের খাবার সৃষ্টি করিয়াছেন, যোগান দিয়াছেন, তিনি কি তোমাদের কথা শুনিতে পান না? তিনি কি তোমাদের দেখিতে পাননা। অবশ্যই দেখিতে পান, তাই না? কারণ আকাশ বাতাসতো মানুষের কথা মত চলে না, মানুষের কথামত কার্য্য সম্পাদনও করে না, তবু যদি মানুষ রেডিও টেলিভিশন সৃষ্টি করিতে পারে, আর বাতাসের ইথারের মাধ্যমে তাহা হইতে খবর দূর দূরান্তরে পৌছাইয়া দিতে পারেন, আর আকাশ ও বাতাসতো আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

পৃথিবীর আলো বাতাস, বিদ্যুৎ শক্তি যাহা দ্বারা তোমরা এত কিছু করিতেছ, তাহাতো সেই পরম করুনাময় আল্লাহর সেই মহা শক্তির সামান্য অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম শক্তি মাত্র। বৎস! এইবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পরিয়াছ, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই দেখিতে পারেন। তোমাদের অত্যান্ত গোপনীয় বিষয়ও আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। তুমি যদি অত্যান্ত গোপন স্থানে যাইয়া অত্যান্ত অন্তরের কোন কথা চিন্তা কর, তাহাও আল্লাহ জানিতে পারিবেন। কারণ তোমার আত্মা বা রূহতো আলাহর আদেশ মাত্র এবং আল্লাহ তাঁহার নিজের রুহ হইতেই তোমাদের 'রূহ' এর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহা দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার 'রূহ' এর সহিত আল্লাহর সম্পর্ক আছে। আর তোমাদের শরীরের সাথে সম্পর্ক আছে মাটির। কারণ মাটি দিয়াইতো আল্লাহ প্রথমে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সেই মহা শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী, মহাবিচারক, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ সুরা বকর ২৫৫ আয়াতে বলিয়াছেন, ''সেই আল্লাহ ব্যাতীত কোনই উপাস্য নাই, যিনি চির জীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান, তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষণ করে না, নভোমন্ডলে যাহা কিছু আছে ও ভুমন্ডলে যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহারই। সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যাতীত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ ধারণা করিতে পারেনা। তাঁহার আসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং ইহাদের সংরক্ষণে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় না।''

আলাহ বলেন, ''অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকেই স্মরণ করিব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও, আর অবিশ্বাসী হইও না।''

(সুরা বকর ১৫২)

আল্লাহ বলেন, ''হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা ধৈর্য্য ও আরাধনা সহকারে সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী। **(সুরা বকর ১৫৩)**

বৎস! এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কত গুপ্ত রহস্য লুকায়িত আছে। আল্লাহর সৃষ্টিতে তরঙ্গায়িত হয় ইথার। এই ইথারের সাহায্যেই মানুষের কথা, শব্দ, ভাসিয়া যায় দূর দূরান্তরে। আর ইলেক্ট্রন, প্রোটন এর খেলা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলেরই সাক্ষ্য দেয়।

বৎস! শোন, সবাই আজ পাঠ করিতেছে, ''লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'' ইহার অর্থ আল্লাহ ব্যাতীত অপর কোন স্রষ্টা নাই। এই বাক্যটি জিকির করিয়া এলমে মারেফাত লাভ করা যায়। তুমি যদি কালেমা তাইয়েবা, কালেমা শাহাদৎ ও সুরা এখলাস পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় পাইয়াছ।'' সুরা এখলাসে আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, ''হে মুহাম্মাদ (সঃ) বলঃ– আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না। তিনি কাহারও জাত নহেন। এবং কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।

বৎস! একজন কোরাইশ হযরত রাসুল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার আল্লাহ তালার সিফত বর্ণনা করুন। তাহার জবাবে এই সুরা নাজিল হয়।

(বোখারী শরীফ)

এই সুরায় আল্লাহ সর্ম্পকে যে সকল শক্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি কার্য্যকারী হয় না। এই জন্যই এই সুরাটির নাম হইয়াছে এখলাস''।

এই সুরায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে আল্লাহ কাহাকেও জন্ম দেন নাই। যদি আল্লাহ কাহাকেও জন্ম দিতেন, তবে তাহার মধ্যে আল্লাহর মত স্বভাব পরিলক্ষিত হইত আল্লাহ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই, যদি আল্লাহ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং তিনি কখনও মহা বিচারক ও ন্যায়পরায়ন হইতে পারিতেন না। আল্লাহ ন্যায় পরায়ন এবং সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তাঁহার মুখাপেক্ষী।

এই সুরা দ্বারা আল্লাহর একক আধিপত্য ঘোষণা করা হইয়াছে এবং আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কাহাকেও এবাদৎ করা হইতে বিরত করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তালার একছত্র আধিপত্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সুরা মোমেনের ঈমানের মূল ভিক্তি। সেই কারণেই এই সুরা পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান মর্য্যাদার অধিকারী। এল্‌মে মারেফাত অর্জনের জন্য এই ছুরাা জিকির করা হয়। এই সুরা নিয়মিত পাঠকারীকে আল্লাহতালা ভালবাসেন এবং নিত্য নূতন জ্ঞান দান করেন এবং আসমানী বালা জমিনি বালা হইতে আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করেন। তাই মোমেনদের নিকট এই সুরা খুবই প্রিয়।

বৎস! পূর্বেই বলা হইয়াছে ''মানব আত্মার সহিত আল্লাহর সম্পর্ক আর মাটির সহিত সম্পর্ক মানুষের দেহ পিঞ্জরের।'' এই সুরা পাঠের ফলেই মানব আত্মার সহিত আল্লাহর যোগসূত্র স্থাপন হয়। দীর্ঘ দিন নিয়মিত পাঠ করিলে আল্লাহ মানব আত্মাকে আয়নার মত চকচকে করিয়াদেন। বৎস! মানব আত্মার সহিত যেহেতু আল্লাহর সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই হেতু আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে কিছু কিছু বলা হইল।

বৎস। পবিত্র কোরআনের সুরা সমুহের বিভিন্ন আয়াতে এবং মেশকাত শরীফে আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, ''আল্লাহ চির বিদ্যামান, তিন একক, তিনি অনন্ত নিরপেক্ষ তিনি কাহারও দ্বারা জন্ম গ্রহন করেন নাই এবং কাহাকেও জন্মদান করেন নাই; কেহ তাঁহার সমকক্ষ ও শরীক নহে। তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন ও চিরকাল থাকিবেন। তিনি স্থান ও কালের গন্ডিভূক্ত নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী, তিনি দয়াশীল ও দয়াময়। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। জগতের সব কিছুই তাঁহার ইচ্ছামত হইতেছে, তিনি সব কিছুই জানেন, দেখেন ও শুনেন। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর পরমাণূ, গুপ্ত হইতে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীন হইতে ক্ষীনতর শব্দ, কিছুই তাহার দেখা, শুনা ও জানার বাহিরে নহে। তিনি কথা বলেন, পবিত্র্ কোনআন তাঁহার বাণীও কালাম। কিন্তু এই সকল গুন প্রকাশের জন্য তিনি আমাদের ন্যায় দেহ বা কোন ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি এই সকল গুন কিভাবে প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই

জানেন। বৎস! অত্যান্ত আশ্চায্য হওয়ার কথা এই যে উহা মানুষের সামান্য জ্ঞান সীমার বাহিরে অবস্থিত।

আল্লাহ সমস্ত সৎগুনাবলীতে গুনান্বিত এবং পবিত্র। তিনিই জগৎকে মানুষকে ও মানুষের কার্য্যাবলীকে বস্তু ও বস্তুর গুনাবলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট হুকুমজারী করার অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবন যাপনের জন্য যাবতীয় আবশ্যক পদ্ধতি নির্ধারন করিয়াছেন। বৎস! আমরা মানুষ আল্লাহর এই সকল নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য। তাহার কোন হুকুম বা কার্য্যই অন্যায় ও অবিচার প্রসূত নহে। তিনি যাহা করেন, সবই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য এবং তিনি যাহা করেন নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন।

তিনি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুকে বা বস্তু সমূহকে যেভাবে বা যে আকার বা যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাই তাহার আকার বা যে রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাই তাহার উপযোগী এবং উহাই তাহার মঙ্গল। পরম করুনাময় আল্লাহ যাহাকে যাহা দান করেন, নিজ গুনে নিজ অনুগ্রহেই তাহা করিয়া থাকেন। বৎস! আল্লাহর অস্তিত্ব, সৃষ্টি মহিমা ও গুন সম্পর্কে বলিতে গেলে শেষ করা যাবে না। তোমার সমস্ত জীবনভরও শুনানো যাইতে পারে।

আশা করি আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার ঈমান দৃঢ় এবং মজবুত হইয়াছে। মুসাফির। ঈমান, ইসলাম ও ফেরেস্তাগন সর্ম্পকে সামান্য কিছু শুনাইলে তৃপ্তি পাইতাম, পাইতাম আরও আনন্দ। বৎস! তবে শোন হযরত আবু হুরাইরা (রঃ) বলেন,''হযরত রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রহিয়াছে। তাহার প্রথমটি এবং শ্রেষ্ঠটি হইল,''আল্লাহ ব্যাতীত কোন মাবুদ নাই, এই ঘোষণা করা এবং সব চাইতে নিম্নটি হইল, ''পথ হইতে কষ্ট দায়ক জিনিষ অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। **(মোয়াত্তা)**

বৎস! পরকাল অর্থ এখানে ইহকালের জীবনাবসানের পর হইতে যে কাল আরম্ভ হয় সেই কালকেই বুঝান হইয়াছে।

সুরা আনফাল ২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''তাহারাই মোমিনি, আল্লাহর নাম লওয়া হইলে যাহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এবং আয়াতে এলাহী পাঠ করা হইলে বৃদ্ধি পায় তাহাদের ঈমান, তাহারা আপন রব্বের উপর নির্ভরশীল।

পরকাল সম্পর্ক তুমি এইরূপ বিশ্বাস করিবে যে, সেকাল সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছ আমাদের যে সকল সংবাদ দিয়াছে, তাহা সত্য। পরকালের বিশ্বাস মানব চরিত্রের ও ঈমানের বুনিয়াদ।

বৎস! এই সম্পর্কে বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ''হযরত আনাছ (রঃ) বলেন, ''হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যাক্তি নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলা বা কাবাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবেহ করা পশুর গোস্ত খায়, সে অবশ্যই ঈমানদার এবং মুসলিম। তাহার জানমাল ও ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আল্লাহর এবং রাসুলের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। সুতরাং তোমারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভংগ করিও না। অর্থাৎ আইনগত অধিকার ব্যাতীত তাহার জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না।'' হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, ''রাসুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, আমি মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, যে পর্যন্ত না তাহারা ঘোষণা করে যে, ''আল্লাহ ব্যাতীত কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল, এবং বুঝিতে আদিষ্ট হইয়াছি, যে পর্যন্ত না তাহারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তাহারা এইরুপ করিবে, আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জানমাল নিরাপদ থাকিবে, কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেহ দন্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জানও মালের দন্ড হইবে। দুনিয়াতে তাহাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কাযকলাপই গৃহীত হইবে এবং তাহাদের অন্তর আত্মা সম্পর্কে বিচারের ভার আখেরাতে আল্লাহর উপরই ন্যাস্ত হইবে।

(হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম উভয়েই রেওয়াত করিয়াছেন)

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, ''রাসুল (সঃ) বলেছেন, ''সে-ই, ঈমানের স্বাদ পাইয়াছেন, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে রাসুল হিসাবে পাইয়া সন্তষ্ট রহিয়াছেন''

(মুছলিম)

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, ''রাসুল (সঃ) বলেছেন, ''তোমাদের কেহ, মুমিন হইতে পারিবেনা, যে পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট, তাহার পিতা, তাহার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ হইতে প্রিয়তর হই।'' **(মেশকাতশরীফ)**

এইরূপ বিশ্বাসের ফল এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির জীবন আল্লাহর হুকুমের অধীন হইয়া যায়। সে কখনও আল্লাহর হুকুমের খেলাপ করিতে পারে না। যাহার ঈমান এই ফলদান করে নাই, তাহার ঈমানের শক্তি সম্পর্কে তাহার শংকিত হওয়াই উচিৎ। সম্ভবতঃ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) ঈমানকে একটি 'মো' আছাদা' বা 'প্রতিজ্ঞা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ''আল্লাহর রাসুলের হাতে বয়আত করার অর্থই হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে তিনি আমাদের যাহা পৌছাইয়াছেন, জীবনের প্রত্যেক স্তরে তাহা পালন করার প্রতিজ্ঞাকরা" সুতরাং উহা পালন না করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের শামিল।

বৎস! মানুষ, মানুষের আত্মা ও শরীরের পরিনতি সম্পর্কে বলিতে গেলে অনেক বিষয়ের উপর বলা, ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, সেই কারণে এখন ফেরেস্তাগন সম্পর্কে তোমার কিছু জানা দরকার।

ফেরেস্তাগন আল্লাহর সৃষ্টি সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম সৃষ্টি। তাহারাও আল্লাহর 'নূর' হইতে তৈয়ার হইয়াছে। তাহারা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাহারা নারী ও নহেন পুরুষও নহেন, তাহাদিগকে আল্লাহতালা সৃষ্টি পরিচালনার নানাবিধ কাজে নিয়োগ করিয়াছেন। তাহারা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। তাহাদের আমরা দেখিনা বলিয়াই তাহাদের অস্তিত্বকে অস্বিকার করিতে পারিনা–কারণ আমাদের কোন জিনিষ না দেখা বা না হওয়ার কারণহইতেপারেনা।

এই পৃথিবীর পানি, বাতাস ও মাটির মধ্যে এমন অনেক জীব ও জীবানু রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইনা কিন্ত যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাই, যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, আমার প্রশ্ন– তখন কি তাহারা ছিলনা?

দুইশত বা, আড়াইশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমরা কোন গ্যাসের সন্ধান পাইনাই। তাই বলিয়া কি গ্যাস পৃথিবীতে ছিল না?

এতদ্বভিন্ন কোরআন এবং হাদিসে যখন তাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে, কোরআন এবং হাদিস মান্য করার পর তাহাদের (ফেরেস্তাদের) প্রতি অবিশ্বাসের কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ফেরেস্তাগন সব সময় আহার নিদ্রা ব্যতিত আমাদের কৃত কর্মের হিসাব রাখিতেছেন, আল্লাহর নির্দেশ, আদেশ, নিষেধ বিনয়াবনত মস্তকে পালনকরিতেছেন।

আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল রহিয়াছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার কার্যে আল্লাহর নির্দেশে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

আল্লাহতালা মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করার পর এবং তাহাতে রুহ দান করার পর একমাত্র ইবলিস ব্যাতিত অন্যান্য সমস্ত ফেরেস্তাই আল্লাহর নির্দেশে আদমকে সিজদা করিয়াছেন। এবং আদমের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহন করিয়া বা মানিয়া লইয়াছেন। ইবলিস কেবল মাত্র আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছে এবং বহিষ্কৃত হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ফেরেস্তাগনের মধ্যে আজরাইল (আঃ), জিব্রাইল(আঃ), ইসরাফিল (আঃ), মিকাইল(আঃ) কেরামিন, কাতেবিন, মুনকের ও নেকের (আঃ) সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অনেক কিছুই জানে, ইহা ছাড়াও আরও অনেক অসংখ্য ফেরেস্তা আছেন, কোরআন ও হাদিস পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়।

ঈমানে মুফাচ্ছলে বলা হইয়াছে, "আমি ঈমান আনিতেছি আল্লাহর উপর, তাঁহার ফেরেস্তাগনের উপর তাঁহার রাসূলের উপর, শেষ বিচারের দিন, ভাগ্যের ভালমন্দ আল্লাহর ইচ্ছায়ই হইয়া থাকে। তাহার উপর এবং দেহ ত্যাগের পর পুনরুত্থানের উপর।"

বৎস! তাহা হইলে আল্লাহ, আল্লাহর নবী, রসূল, ফেরেস্তা কিয়ামত ও শেষ বিচার, দেহত্যাগ ও পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর সুগভীর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া বিশ্বাস করার নামই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। এই বিশ্বাস এবং এবাদতের ফলেই আত্মার উন্নতি হয়, আর সৃষ্টি হয় আল্লাহর সাথে আত্মার সুগভীর সম্পর্ক।

সুরা আম্বিয়া ২১,৬ এবং ১২ আয়াতে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষনা করা হইয়াছে– নিশ্চয়ই সকল মানুষের ভ্রাতৃত্বের উৎপত্তি একই জায়গা হইতে। প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভ্রাতৃত্ব, একই ভ্রাতৃত্ব এবং আমিই তোমাদের প্রভু। সুতরাং আমাকে ভয়কর। মানব সমাজ নিজেরাই তাহাদের বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে বিভক্ত করিয়ছে এবং প্রত্যেকে তাহার নিজের আইন ও রীতি–নীতিতে উল্লাস প্রকাশ করে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আলমুমিনিন ২৩,৫২,৫৩ ও ৫ আয়াতে বলা হইয়াছে "পূর্বে মানুষ একই জাতির ছিল। পরবর্তী কালে মানুষ তাহাতে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহ বিচ্ছিনতাকারীগনকে বা বিচ্ছেদকারীগনকে পচ্ছন্দ করে না।" ইহাতে প্রমানিত হয় যে আল্লাহ মোমিন সৃষ্টি করিয়ছেন এক বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি করার জন্য।

সুরা ইউনূছ ২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ইহা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের কিছু নয়, যে আমি তাহাদেরই একজনকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিয়াছি, মানবদের সতর্ক কর, এবং সুসংবাদ দাও মোমেনদের, তাহাদের জন্য স্বীয় রবের কাছে আছে উচ্চপদ। সুরা উইনুছ ১৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, লোক ছিল দ্বীনের একই তরিকায়, মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে পরে।

সুরা উইনূছ ৩১ আয়াতে আল্লাহকে এই বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, আসমান ও জমিনের সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ।" আল্লাহ মানুষকে ভোগের অধিকার দিয়াছেন, তবে বিলাসিতা ও অপব্যায় করার কোন অধিকার দেন নাই। কারণ আল্লাহ অপচয়কারীকে পচ্ছন্দ করে না। মানুষ মানুষকে শোষন করে, সঞ্চয় করে কিন্ত আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে না, তাহাদের জন্য পরকালে আছে মহা শাস্তি। পবিত্র

কোরআনের ভিত্তিতে মানুষ ভ্রাতৃত্ব বোধের তাগিদে এবং পৃথিবীর মানব সন্তান কে কর্তৃত্ব না দিয়া সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর উপর অর্পন করা। এবং মানবের সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া ইসলাম এক আদর্শ জীবন প্রনালী প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়াছে।

ইসলামের এই নীতি সবাই মানিয়া চলিলে, কোন দেশই অপর কোন দেশকে শোষন করিতে পারিত না। মানুষ যদি পৃথিবীতে কোরআনের আদর্শ, আদেশ ও নিষেধ মোতাবেক আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহে, তাহা হইলে মানুষকে আল্লাহর সমস্ত গুনে গুনান্বিত হইতে হইবে। আল্লাহ তাঁহার নিজের রুহ দিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই প্রত্যেকের উচিৎ একে অপরকে শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা এবং দৃষ্টি রাখা উচিৎ অপরের ন্যায্য অধিকারের উপর।

বৎস! আমাদের কেহ কেহ মনে করেন কোরআন উল করীম কেবল মাত্র মুসলমানদেরই ধর্ম গ্রন্থ। ইসলামে মানব জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আল্লাহ এই দুনিয়ায় মানুষকে প্রকৃত প্রতিনিধি হইয়া আল্লাহর বিধান মত এই দুনিয়াকে পরিচালিত করে। ইহার জন্য তাহাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে পবিত্র কোরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন,

"He prayeth best who loveth best,
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all."

(S. T. Coleridge)

বৎস! ইহাইতো ইসলামের আদর্শ। ইসলামে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, কারণ যাহা ইহকালের জন্য মঙ্গলজনক তাহা পরকালের জন্যও মঙ্গলজনক বলিয়া গ্রহন করা হইয়াছে। ইহকালের ক্রিয়া কর্মের ফলাফলের জন্য ইহকালের সহিত পরকালের যোগসূত্র স্থাপন করিয়া পরকালের বিধি ব্যবস্থা প্রনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু পরকালের ব্যাপারটি রহস্যজনক বলিয়া কোন বিশেষ শ্রেনীর কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

ইসলাম প্রাথমিক যুগ হইতেই ইহকালের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করিয়া মানব জীবনকে সুন্দর ও সমুজ্জল করার চেষ্টা করিয়াছে। যাহাতে একদল মানুষ সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার জন্য পবিত্র কোরআনে প্রকৃত মোমিন সৃষ্টির জন্য তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। "ইসলামের লক্ষ্য হইল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবাদের সৃষ্টি করা, তার প্রমান পাওয়া যায় মানবতাবোধের সৃষ্টির জন্য

পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার আয়াত সমূহে। পবিত্র কোরআনে অপরাধ মুক্ত ও উদার জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের তাগিদ রহিয়াছে।

আল্লাহর সৃষ্টি মাটি, আগুন, পানি, বাতাস, চন্দ্র–সূয্যের আলো সকল মানুষ সমান ভাবে ভোগ করিয়া থাকে, তাই ধনী কর্তৃক গরীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন, সরল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচার যুলুম করা আল্লাহ পচ্ছন্দ করেন না। তাই দার্শনিক ভলেটয়ার বলিয়াছেন, " মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম গ্রহন করিয়া সর্বত্রই অধীকার হারাইয়া শৃংখলাবদ্ধ হয়।" আর ইসলাম বলে, হে মানুষ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না, খর্ব করিও না, চলিতে দাও তাহাকে স্বাধীন ভাবে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতাস্বীকার করা। ইসলাম ধর্ম অর্থ শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মাবলম্বি মানুষ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করিয়া থাকে, এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট মাথানত করেন না।

"ইসলাম" অর্থ প্রত্যেক মানুষ কর্তৃক অপর মানুষের ভালবাসা, ব্যাপক অর্থে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকেই ভালবাসা ইসলামের আদর্শ। কারণ ইসলাম নিষ্ঠুরতাকে পচ্ছন্দ করে না। ইসলামে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রহিয়াছে। ইসলামে কোন জাতিভেদ নাই। কারণ সকল মানুষ একই আদম হইতে আগত। এবং আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইসলামের আদর্শ হইল ইমানদার সকল মানুষ ভাই ভাই, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের হৃদয়ের বন্ধন স্থাপন করা এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের হৃদয়ের বন্ধন স্থাপন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। অপরের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা, দুঃখ মোচনের চেষ্টা ও সাধ্যানুযায়ী সহানুভূতি প্রদর্শন করা, পরষ্পর পরষ্পরকে বিপদে আপদে সাহায্য করা কারণ ইসলাম হিংসা কার্পন্য ও নিষ্ঠুরতা পচ্ছন্দ করে না। কিম্বা অতিরিক্ত ভোগ বিলাস ও অতিরিক্ত শারীরিক কৃচ্ছতা সাধনও পচ্ছন্দ করেনা। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা বকর এর ১৮৫ আয়াতে পরম করুনাময় আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের পক্ষে যাহা কষ্টকর, দুঃসাধ্য তাহা আল্লাহ পচ্ছন্দ করে না।"

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ, তাঁহার দেওয়া ধন–সম্পদ ও টাকা –পয়সার অপচয় করা, সৎকার্য্য ব্যতীত অসৎ কার্য্যে ব্যয় করা পচ্ছন্দ করেন না।

বৎস! যদি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রানিত হও, তবে আল্লাহ তোমার জান ও মাল, মান–ইজ্জত–সম্ভ্রম ইত্যাদির জিম্বাদার হইবেন, জিম্বাদার হইবেন প্রিয় নবী(সাঃ)।

বৎস! স্মরণ রাখিও, সমস্ত কিছুরই একটি সীমা আছে। পৃথিবীর ক্ষনস্থায়ী জীবন যাপনের জন্য কোন বিষয়েই সীমা অতিক্রম করা উচিৎ নহে।

পবিত্র কোরআনের সুরা আ'র–ফ এর ৫৫ আয়াতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলিয়াছেন, " সীমা লংঘন কারীকে আমি পচ্ছন্দ করি না।" এই সুরার ৫৬ আয়াতে বলা হইয়াছে, "পৃথিবীতে শৃংখলা আসার পর তোমরা বিশৃংখলা আনয়ন করিওনা।

এই আয়াত দুটিতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর মানব সন্তানদের হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, সীমা লংঘনকারীকে এবং শান্তি শৃংখলা ধ্বংস ও বিনষ্টকারীকে আল্লাহ পচ্ছন্দ করেন না। আল্লাহ এই আয়াতে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজকে শান্তিতে রাখিতে চাহেন। সেই শান্তি ভঙ্গ করিলে, বিশৃংখলা সৃষ্টি করিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসিবেন না। তাই মহৎ ব্যক্তিগন মানুষের কষ্ট, অশান্তি দুরকরিবার জন্য যুগে যুগে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আল্লাহতালা মানুষকে শান্তিতে বসবাস করার নির্দেশ দিয়াছেন। এবং শান্তি ও শৃংখলা যাহাতে ধ্বংস ও বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া পরস্পর প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করিবার আহব্বান জানাইয়াছেন। এই আয়াতে পৃথিবীর ধনসম্পদ হই. . আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিষয়ে শৃংখলার সাথে সুষ্ঠ বিলিবন্টনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এবং যাহারা আল্লাহর এই নির্দেশ ভুলিয়া যাইবে এবং ভুলিয়া যাইবে রাসুল(সাঃ) এর আদর্শ ও উদারতাকে, যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে, তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহতালা এই সুরার ৪০ আয়াতে বলিয়াছেন, "আমি পাপীদিগকে শাস্তি দিব।" এই সুরার ৪১ ও ৪৪ আয়াতে আল্লাহ ঘোষনা করিয়াছেন, ''ওদের জন্য আগুনের শয্যা রহিয়াছে। আল্লাহর লানত বা অভিশাপ রহিয়াছে অত্যাচারী ও জালেমের প্রতি।

আর যাহারা ঈমানদার, যাহারা ইসলামকে ভালবাসিয়াছেন, ইসলামের আদর্শকে মনে প্রানে গ্রহন করিয়াছেন এবং নিত্য সঙ্গী করিয়াছেন ইসলামের পবিত্রতাকে, পৃথিবীতে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহারাই ঈমানদার। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহতালা এই সুরার ৪২ আয়াতে বলিয়াছেন, "যাহারা ঈমানদার তাহারাই হইবে স্থায়ী জান্নাতবাসী।

সুরা 'হুদ' এর ৫ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "আল্লাহর অবাধ্যরা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছে। অথচ তাহারা জানেনা, কোন গোপনই তাঁহার কাছে অজানা নহে।" **(ইবনেজরীর)**

সুরা উইছুফের ৫৬ ও ৫৭ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছন, "সৎ কর্মীদের কর্মফল আমি বিনষ্ট করিনা এবং যাহারা ঈমানদার ও মুত্তাকী তাহাদের ভালকাজে পুরস্কার দেওয়াই উত্তম।

সুরা 'নাহল' ১২৮ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "সাবধানীদের সঙ্গে আছেন আল্লাহ, আছেন সৎকর্মশীলদের সঙ্গে।"

মানুষের মধ্যে আছে নফস বা প্রবৃত্তি। অর্থাৎ ইচ্ছা বা লালসা বা দুরাশা, যাহা পাইতে শৃংখলা ভঙ্গ করিয়া বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে হয়, আইন ভঙ্গ করিয়া অপরাধ করিতে হয়, সত্যের পথকে ভুলিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, সেই নফস, ইচ্ছা বা লালসাকে অবদমিত রাখিতে পারাই মুক্তির সনদ। এই নফ্স বা প্রবৃত্তিকে ৩ প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমনঃ–(১) নফ্সে আম্মারা, এই নফ্স মানুষকে মন্দের দিকে টানে(২) নফ্সে লাউয়ামা, এই নফ্স মন্দ হইতে বিরত এবং ভালোর উৎসাহ দেয়। (৩) নফ্সে মুতমায়েন্না, এই নফ্স যাবতীয় মন্দ কাজ হইতে সব সময় বিরত রাখে এবং ডুবিয়া থাকে আল্লাহর প্রেম সাগরে।

বৎস! স্মরণ কর, সেই করুনাময় আল্লাহকে তিনি বড়ই উদার, বড়ই মহৎ। আল্লাহ তাঁহার মহত্বের গুনে মানুষের দুঃখকষ্ট বিদুরিত করেন, দান করেন ধনসম্পদ, দুরকরেন বালা মছিব্বত। কিন্ত বোকা মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়, অহংকার করে, গর্ব করে।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা হুদ এর ৬, ৭, ১০ ও ১১ আয়াতে বলিয়াছেন, "জমিনে অবস্থিত প্রত্যেক জীবের রিজেকের তিনিই জামিনদার এবং তিনিই জ্ঞাত। আর তিনিই সর্বশক্তিমান যিনি সৃজন করিয়াছেন আসমান ও জমিন মাত্র ছয় দিবসে, আর তখন তাঁহার তখ্ত ছিল পানির উপরে। আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। তোমাদের পূর্ণবার উঠানো হইবে মৃত্যুর পরে।" ১০ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "মানুষের দুঃখকষ্ট ভোগের পর যদি অনুগ্রহের আস্বাদ দেই, তাহা হইলে মানুষ বলিতে থাকে, আমার কষ্ট বিদুরিত হইয়াছে, কারণ মানুষ শীঘ্রই খুশী হয় এবং অহংকার করে। ১১ আয়াতে বলা হইয়াছে, "কিন্ত যাহারা সহিঞ্চু এবং পূন্যকার্য করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার।"

আল্লাহর দাসত্ব গ্রহন এবং তাঁহারই ইবাদত কল্পে পবিত্র কোরআনের বিধান সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মানুষের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে আগমন করিয়াছেন নবীগন। পবিত্র কোরআনের সুরা 'রা' আদ' এর ২৬ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার রিজিক বৃদ্ধি করিয়া দেই এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা হ্রাস করি, কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে আনন্দিত অথচ ইহজগৎ, পরকালের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।

এই সুরায় ২৮ ও ২৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, "যাহারা ইমানদার, তাহাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, আল্লাহর রিজিকেরই হয় চিত্ত প্রশান্ত। আর যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে, তাহারাই ঈমানদার, মঙ্গল ও শুভ পরিনাম তাহাদের জন্যই।

সূরা 'নাহল' এর ১২৭ আয়াতে আল্লাহ সৎ, ঈমানদার ও ন্যায় বিচারকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর, তবে ধৈর্য্য ধারণ হইবে আল্লাহর মদদে, ওদের ব্যবহারে দুঃখিত হইওনা এবং ষড়যন্ত্রে ও অত্যাচারে হইও না মনক্ষুন্ন।

বৎস! ইসলাম মানুষকে এই সকল গুণে গুণান্বিত হইবার আহ্বান জানায়, পবিত্র কোরআনের ঐ সকল সুরা ও আয়াত অনুসরণ করিলে হকিকত ও মারেফাত অর্জন করা যায়, রূহানী তেজক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, আর তখনই আল্লাহর ইচ্ছায় করিতে পারে মানুষ অসাধ্য সাধন। বৎস! আল্লাহর দেওয়া রুহানীশক্তি, তেজস্ক্রিয়া ও গুপ্তবিদ্যা অর্জন করিয়া সৎ ও কুকার্যে এবং বিনা কারনে ব্যয় করিলে তাহার জন্য আল্লাহর কাছে রহিয়াছে কঠোর শাস্তি।

বৎস! কখনও গর্ব করিও না যে, তুমি কোনবিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছ কিম্বা বেশী পূন্য করিয়া আল্লাহকে তুষ্ঠ করিয়াছ। কারণ তুমি কত বড়, তাহা অন্য কেহ না জানিলেও আল্লাহর নিকট কিন্তু গোপন থাকে না। পবিত্র কোরআনের সুরা ' ইব্রাহিম' এর ৫১ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "আল্লাহ প্রত্যেককে দিবেন তাহার কৃতকর্মের ফল। কারণ হিসাব গ্রহনে আল্লাহ খুবই ত্বড়িৎ।" জানিয়া রাখ সমস্ত কৃতকর্মের জন্যই আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হইবে।

বৎস! তোমার যাহাতে বুঝিতে অসুবিধা না হয়, সেইকারনে কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, অন্যথায় তুমি ভুল বুঝিতে পার। তবে শোনঃ–

ইসলামী বিধান মতে কার্য্য করিতে হইলে বা পৃথিবীতে ইসলামী জীবন–যাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে দৃঢ় ঈমান রাখা খুবই জরুরী। যেমনঃ– আল্লাহ, ফেরেস্তা, কিতাব, নবী–রাসুল এবং আখিরাতের সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। এবং আরও বিশ্বাস রাখিতে হইবে, অহংকার করা, অত্যাচার করা বা অন্যায় করা, মিথ্যা বলা, নিন্দা করা, গালি দেওয়া, মানুষের যে কোন প্রকার ক্ষতিকরা, ক্ষতিকরার চিন্তা করা, ষড়যন্ত্র করা, আল্লাহ ও নবীর আদেশ নির্দেশ ও জীবন যাপনের জন্য দেওয়া বিধান অমান্য করা ইত্যাদি কার্যকলাপ পাপ। সমস্ত অন্যায় কথা ও কাজে গোনাহ হয়।

আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে সত্যকথা বলা, কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা, মানুষের উপকার করা সৎকার্য্য ও সর্বদা সৎ চিন্তা, পিতা-মাতা, শিক্ষক, মুরব্বীগণের কথা মান্য করা, তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও করুনা করা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আদর করা, হালাল জিনিষকে গ্রহণ ও হারাম জিনিষকে বর্জন এবং প্রত্যেকের সাথে হাসি মুখে কথা বলা এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা। ইত্যাদি ইসলামের আদর্শ এবং এই আদর্শে অনুপ্রানিত মানব সন্তানকে ঈমানদার বা মোমেন বা মোত্তাকী বলা হইয়াছে। ইসলামের এই সামগ্রিক বিশ্বাসকে 'আকাইদ' বলে।

পবিত্র কোরআনকে সাক্ষ্য রাখিয়া, নবীর আদর্শকে পবিত্রতাকে সাক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে জানাইতেছি এইসব মোমেন, ঈমানদার, মোত্তাকী, সৎকর্মী ইহাদের জন্যই আল্লাহর কাছে আছে পুরস্কার, আছে জান্নাতুল ফেরদৌস।

সুরা 'নাহল' ১২৭ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর, ওদের ব্যবহারে দুঃখিত হইওনা এবং ষড়যন্ত্রে ও অত্যাচারে হইওনা মনোক্ষুন্ন।"

বৎস! তুমি যদি অত্যাচারে ও ষড়যন্ত্রে দুঃখিত হও ক্ষুদ্ধ হও, তবে ঈমান নষ্ট হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিবে। আল্লাহ ধৈর্য্য ধারণকারীদের সঙ্গে থাকেন। বৎস! এই ধৈর্য্য ধারণ সম্পর্কে একটি ঘটনা শোন!

মহাত্মা ওয়ায়েছকরনীকে ছোট ছোট বালকগন দেখিলেই তাহাকে পাগল বা বিকারগ্রস্ত লোক মনে করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিত। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "হে বালকগন, যদি তোমাদের পাথর মারিতেই হয় বা তোমরা আমাকে পাথর মারিয়া আনন্দ পাও, তাহা হইলে ছোট ছোট পাথর মারিও, যেন আমার শরীরের রক্ত বাহির না হয়। কারন রক্ত বাহির হইলে আমি নামাজ পড়িতে পারিব না।

একদা হযরত ছহল তশতরীকে সৎ স্বভাবের ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি বলেন, (১) অন্যের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য্য ধারন করা (২) প্রতিশোধ গ্রহন না করা (৩) অত্যাচারির প্রতি করুনা প্রদর্শন করা (৪) তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং (৫) তাহার প্রতিদয়া করা।

মুসাফির। যাঁহারা ঈমান লইয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের কিভাবে চিনিতে পারা যায়?

বৎস! তুমি এতক্ষনও বুঝিতে পারনাই! তবে শোন; "যাঁহারা ঈমান লইয়া জীবন যাপন করেন তাঁহাদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার হয় নির্মল ও সুন্দর। তাঁহারা তাঁহাদের মন-মগজ, হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান, সব কিছু একমাত্র আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ও মহানবী (সঃ) এর দেওয়া বিধান অনুযায়ী

ব্যবহার করেন। তাঁহারা খারাপ চিন্তা হইতে মনকে দূরে রাখে, বিরত রাখে কর্নকে মন্দ কথা শোনা হইতে, মিথ্যাকথা বলা হইতে জিহ্বাকে হিফাযত করে।

ঈমানদারগন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদৎ করেন অন্য কাহারও নিকট নতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

বৎস! শোন জল, স্থল, আকাশ ও মহাকাশে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর সৃষ্টি। যাঁহারা আল্লাহকে জানেন, বোঝেন, অনুভব করেন এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তাহাদেরই বলা হয় মুসলিম।

মুসলমানগন আল্লাহর কালেমা পাঠ করিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মনে প্রানে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের হুকুম পালন করেন।

বৎস। আল্লাহতালার মহান সৃষ্টির মধ্যে যদি লক্ষ্য কর দেখিতে পাইবে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই শৃংখলা বজায় রাখিয়া নিজ নিজ স্বভাবমত একই নিয়মে চলিতেছে। এই বিষয়ে সামান্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

একটি মুরগীর পেটের নীচে বাচ্চা তোলার অভিপ্রায়ে কিছু মুরগীর ডিম ও কিছু হাঁসের ডিম রাখিয়া দিলে, কিছু দিন পর দেখিতে পাইবে, মুরগী ও হাঁসের ডিম হইতে ছোট ছোট সুন্দর বাচ্চা হইয়াছে, হাঁসের ছানা পানি দেখিলে খুশি হয় আর মুরগীর ছানা পানি দেখিলে ভয় পায়। হাঁসের ছানা পানি দেখিলে পানিতে চলিয়া যায় এবং সাঁতার কাটে, আর মুরগীর ছানা পানি হইতে দুরে সরিয়া যায় এবং পানিতে পড়িলে মারা যায়। ইহাই হইতেছে স্বভাব। এই স্বভাব আল্লাহ দান করিয়াছেন। এই স্বভাবের বিপরীতে যদি কেহ কিছু করিতে যায় তাহা হইলে দুর্ঘটনা ঘটে, বিপদ হয়। বৎস। পৃথিবীর মানুষের কি এমন কোন ক্ষমতা আছে যে, মুরগীর ছানার স্বভাব বদলাইয়া দিতে পারে?

আল্লাহ তাঁহার নিজের রুহ হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারনে মানুষের মধ্যে আছে বিভিন্ন সৎগুনাবলী। পৃথিবীতে এত সৎ গুনাবলীর বিকাশ সাধন করিবার পরবর্ত্তী পর্যায়ে মানুষ পরিনত হয় মোমীনে, হয় মুত্তাকীন এবং অর্জন করিতে পারে এলমে মারেফাত বা গুপ্ততত্ত্ব।

বৎস। বৈজ্ঞানিকগন বলিয়া থাকেন, "কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যদি পৃথিবীতে বাতাসের মধ্যে জমা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন জীব-জন্তু বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস খুবই বিষাক্ত।

বৎস। আল্লাহর কি অমোঘ বিধান কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্যাস মানুষের জন্য বিষাক্ত। কিন্তু ঐ বিষাক্ত গ্যাস আবার গাছপালার খাদ্য।

মানুষ বাতাস হইতে নাক দিয়া অক্সিজেন গ্রহন করে এবং ছাড়িয়া দেয় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। এই ভাবে আল্লাহ পৃথিবীর গাছপালাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আবার গাছপালা অক্সিজেন নামক গ্যাস ছাড়িয়া দেয়, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তাহা গ্রহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ঐ সকল গ্যাস আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহই পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়াছেন। মানুষ সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করার জন্য পাগল প্রায় হইয়া বাতাসের ভিতরে আরও অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এখনও অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

মাটির মধ্যে কি আছে? যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইবে এক ইঞ্চি উর্বর মাটিতে দশ কোটিরও বেশী ব্যাক্টেরিয়া আছে। এই ব্যাক্টেরিয়া একপ্রকার অতিক্ষুদ্র প্রানী। অনুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের দেখা যায় না। ইহারা মাটিকে উর্বর করে। মানুষ জমি চাষ করে, বীজ বপন করে, যত্ন করে, কিন্তু জমি উর্বর হয় ও ফসল হয়, পরম করুণাময় আল্লাহরইচ্ছায়।

পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, নদ–নদী, খাল–বিল, সমুদ্র, সাগর ও মহাসাগর। ঐ গুলিকে আবার আল্লাহ পানিতে পূর্ণ করিয়াছেন।

প্রতিদিন সূর্যের তাপে নদ–নদী, খাল–বিল ও সমুদ্র ইত্যাদির পানি হইতে সৃষ্টি হয় একপ্রকার জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্প কিন্ত বাতাসের চাইতেও হালকা। সেই কারণে এই জলীও বাষ্প বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং ধুলিকনার সংমিশ্রনে ঠান্ডা হইয়া বৃষ্টি বর্ষন হয়। এই বৃষ্টির পানির কিছু অংশ আবার খাল–বিল, নদী–নালা ও সমুদ্রে চলিয়া যায় এবং মাটির নীচে পানি জমা হয়।

বৈজ্ঞানিক ইহা বুঝিতে পারিয়া আবিষ্কার করেন টিউবওয়েল। মানুষ নলকূপ ও গভীর নলকূপের সাহায্যে মাটির নীচ হইতে ঐ পানি তুলিয়া পান করে। নলকূপ দ্বারা তোলা পানি বিশুদ্ধ। এই পানির অপর নাম জীবন, কারন পানি ছাড়া কোন প্রানীই জীবন ধারন করিতে পারে না।

বৎস! সত্যই ভাবিতে অবাক লাগে আল্লাহ কিভাবে পানি দিয়া, কিভাবে সূর্যের কিরণ দিয়া মানুষ, গাছপালা, পশু পাখি ও বিভিন্ন প্রানীদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং প্রতিপালন করিতেছেন। তাই সুরা 'নেছার' ১৭০ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যাহা কিছু আছে, তাহা আল্লাহরই এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহা বৈজ্ঞানিক।"

সুরা 'বকর' এ আল্লাহ বলিয়াছেন, "মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যাহা মানুষের মাঝে রহিয়াছে, তাহা তোমাদের নিকট মৃত কিন্তু আল্লাহর নিকট সজীব।" কারণ তাহারা সব সময় আল্লাহর হুকুম পালন করিবার জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। আর হায়রে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ তোমাদের মাটি ও পরে শত্রু হইতে কি কৌশলে তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবু তোমরা সেই পরম করুনাময় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক কর। (সুরহিজরআয়াত,৪)

বৎস। মানুষ মহান আল্লাহ প্রদত্ত তাহার আত্মার সৎ স্বভাবকে কার্য্যে রূপান্তর না করিয়া অসৎ পথে চলিয়া যায় এবং অসৎ স্বভাব তখন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। যে মানুষ চুরি করিতে অভ্যস্থ্য হইয়া যায়, তাহার বিচার করিয়া হাত কাটিয়া দিলে কিম্বা কঠোর শারীরিক নির্যাতন করার পরও দেখা যায় যে, সে চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ্ করিতে পারে না। কারন চুরি করা তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। যখন কোন লোকের স্বভাব খারাপ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ প্রদত্ত্ব সমস্ত সৎগুনাবলী বিলীন হইয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যাহারা পাপকার্য্য করেন, আল্লাহ তাহাদের অন্তরে কালিমা লেপন করিয়া দেন, পর্দা টাঙ্গাইয়া দেন, তাহাদের জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেন।

এই কারনেই পাপীরা সর্বদা পাপ কার্য্য করাকেই পছন্দ করে এবং পাপকার্য্য যথার্থভাবে সম্পাদন করাকেই নিজেদের কৃতিত্ব বলিয়া মনে করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট করে। ইহাই মানুষের খারাপ স্বভাব বা বদ স্বভাব।

মানুষ লোভে পড়িয়া বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া খারাপের দিকে বা পাপের দিকে ধাবিত হয়। লোভে ও ক্রোধে ঈমান নষ্ট করে। বৎস! কখনও লোভের বশবর্ত্তী হইও না।

সৎকার্য্যে সুদীর্ঘ দিন লাগিয়া থাকিলে আনন্দ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় তৃপ্তি। আল্লাহ কোন কোন মানুষকে সৎস্বভাব দ্বারা, লোভ ও ক্রোধকে সংবরন করার ক্ষমতা দ্বারা শরীয়তের অনুসারী করিয়া দুনিয়াতে প্রেরন করিয়াছেন। ঐ ধরনের মানুষ পার্থিব জগতের উচ্চা শিক্ষা ব্যতীতই জ্ঞানী হয় এবং জ্ঞানের মূল্য ও জ্ঞানীর কদর বুঝিতে পারে।

বৎস! ইসলামতো মানুষকে এই কথাই বলে। এই সমস্ত কারণেই তোমাদের শিশু সন্তানকে ছোটবেলা হইতেই ভাল সংসর্গে মিশিতে দিবে, খারাপ সংসর্গে কোনদিনও যাহাতে মিশিতে না পারে, তজ্জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে, যাহাতে তাহারা সৎকার্য্যের দ্বারা সৎস্বভাবকে অর্জন করিতে পারে এবং কুকার্যকে বা

পাপ কার্য্যকে ছোটবেলা হইতেই ঘৃনা করিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সৎকার্য্যের প্রতি তাহাদের আগ্রহ বাড়িয়া যাইবে এবং সৃষ্টি কর্তাকে জানিতে ও বুঝিতে পারিবে। তখন তাহাদের জ্ঞান চক্ষু আল্লাহর ইচ্ছায় উন্মোচিত হইবে এবং আল্লাহর দেওয়া জ্যোতি তাহাদের আত্মায় ও শরীরে বৃদ্ধি পাইবে, ভবিষ্যতে তাহারা ঈমানদার ও মোমেন মুত্তাকীনে পরিনত হইবে। এবং খারাপ স্বভাব ও খারাপ চরিত্র যে, আত্মার ব্যাধি তাহা তাহারা জানিতে ও বুঝিতে পারিবে।

বৎস! এই সমস্ত কারণেই হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, "হৃদয় এর উপর ঈমান একটি শুভ্র চিহ্ন অংকন করে, যতই ঈমান দৃঢ হয়, ততই ঐ শুভ্র চিহ্নটি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন কোন লোকের ঈমান দৃঢ হয়, তখন তাহার হৃদয় আল্লাহর দেওয়া জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অপর দিকে মোনাফেকের হৃদয়ের উপর কালদাগ পড়িয়া যায়। আর যখনই মোনাফেকী বৰ্দ্ধিত হয়, তখনই উক্ত কালদাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিশেষে মোনাফেকীর কারণে সমস্ত হৃদয় কাল হইয়া যায়।"

বৎস! এখন হয়তো তুমি অতি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছ যে, মানুষের স্বভাব কখনও কখনও স্বাভাবিক ভাবেই জন্মিয়া থাকে, আবার কখনও কখনও সৎকার্য ও গুনাবলীর দ্বারা এবং কখনও বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জন দ্বারা অর্জন করা যায়।

যে ব্যক্তি এক তিল পরিমান নেককার্য্য করিবে, সে তাহাই দেখিতে পারিবে এবং যে ব্যক্তি একতিল পরিমান পূন্য বা নেক কার্য্য করিবে সেও তাহার ন্যায্য পুরুস্কার পাইবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক, প্রত্যেকের উপযুক্ত পাওনা আল্লাহ ন্যায্যভাবে বন্টন করিবেন। কাহাকেও তাহার ন্যয্য পাওয়ানা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ এতদ্বিষয়ে পবিত্র কোরআনে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন। "আল্লাহতালা কাহারও উপর অত্যাচার বা জুলুম করেন না। মানুষ নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করে।"

বৎস! শোনঃ একদিন রাসূল (সাঃ) কে সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল সবচাইতে বড় জেহাদ কাহাকে বলে? উত্তরে রাসুল (সাঃ) বলেন, "প্রবৃত্তির সহিত লড়াইকে বড় জেহাদ বলে।" তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা প্রবৃত্তির পিছনে পিছনে ছুটিও না। যদি প্রবৃত্তির দাস হও , তবে তাহা কিয়ামতের দিন বিষ সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইবে।"

হয্‌রত জাফর ইবনে হামিদ বলিয়াছেন, "সুখ পরিত্যাগ না করিলে, সুখ ভোগ করা যায় ন।" বৎস! পৃথিবীতে লোভ ও লালসা রাজা–বাদশাহদের গোলাম ও ভিকারী বানাইয়াছে, আবার ভিখারীও গোলামদের আল্লাহতালা রাজা–বাদশাহ বানাইয়াছেন দান করিয়াছেন তাহাদের রাজ–সিংহাসন। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মহাত্মা ইউছুপ ইবনে আছবাত বলিয়াছেন, "সৎ স্বভাবের দশটি চিহ্ন আছে। (১) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা। (২) উত্তম বিচার করা। (৩) প্রতিশোধ গ্রহন না করা। (৪) পাপকে মন্দ জানা ও (৫) তাহাতে ওজর আপত্তি করা। (৬) অন্যের প্রদত্ত অনিষ্ট সহ্য করা, (৭) প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা। (৮) অন্যের দোষ দেখিয়া স্বীয় দোষের বিষয় অবগত হওয়া। (৯) ছোট বড় সকলের কাছে হাসি মুখে আসা। (১০) ছোট বড় সকলের নিকট বিনম্রভাবে কথা বলা।

বৎস! এইবার সৎস্বভাবের আর একটি ঘটনা তোমাকে শুনাইব।

একদা এক ব্যক্তি মহাত্মা আহ্‌নাফ ইবনে কায়েছকে গালাগালি করিতে লাগিল, তিনি তাহার কোন উত্তর দিলেন না। সে তাহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। যখন তাহারা একটি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইল, তিনি আসিয়া বলিলেন, "যদি তোমার মনে আরও কিছু তিরস্কার থাকে, তাহা বলিয়া ফেল, যাহাতে এই গ্রামের নির্বোধ লোকেরা তাহা শুনিতে না পায়। কারণ শুনিলে গ্রামের লোকজন তোমাকে কষ্ট দিতে পারে।"

মহাত্মা এহইয়া ইবনে জিয়াদ হাজেরীর একটি অসৎ গোলাম ছিল। তাহাকে একদিন বলা হইল, কেন আপনি একটি অসৎ গোলামকে রাখিয়াছেন? উত্তরে তিনি জানান, "তাহাকে ধৈর্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাহার স্বাভাব ভাল করারজন্য।"

ছোট শিশুদের মন থাকে খুব কোমল। তাহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, সে তেমনিই হইবে। কারণ মানুষের স্বভাব একটি উর্ব্বর ভূমির ন্যায় অত্যাধিক কোমল। সেখানে যে বীজ রোপন করা যাইবে, তাহাই সুন্দর ভাবে জন্মিবে। যদি তাহাকে সৎপথে ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে সন্দেহাতিত ভাবে সে সৎ হইবে এবং উন্নতমানের হইবে। তাহার ইহকাল ও পরকাল হইবে সুন্দর ও সৌভাগ্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন, "হে মোমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের, পরিবার পরিজনদের দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।" যেরূপ ভাবে পিতা মাতা পৃথিবীর অগ্নি হইতে, বিপদ হইতে সন্তানকে রক্ষা করেন, তেমনি ভাবে সন্তানদের দোজখের আগুন হইতেও রক্ষা করা আরও অধিক উত্তম।

পৃথিবীর মনিষীগন, জ্ঞানী–গুনিগণ, আউলিয়া ও দরবেশগন পরিশ্রম ও ধৈর্য্য দ্বারা তাহাদের স্বভাব চরিত্রের উন্নতি করিয়াছেন। তাঁরা সর্বপ্রকার কৌতুক, হাসি, ঠাট্টা, হিংসা ও প্রতারনা হইতে নিজ নিজ আত্মাকে মুক্ত করিয়া সৎ বিশুদ্ধ ও উজ্জল দর্পনের ন্যায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আল্লাহর নেয়ামতের সঠিক সংরক্ষন ও মিতব্যায়ীতার মাধ্যমে তাঁহার দান ও দয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং বিশ্বাস ও নির্ভরতাই উচ্চাসনে পৌছিবার একমাত্র উপায় যাঁহারা ঐ সমস্ত গুনাবলী অর্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারাই জ্ঞানী, তাঁহারাই আউলিয়া এবং দরবেশ। আল্লাহ তাঁহাদের পচ্ছন্দ করেন, ভালবাসেন এবং দান করিয়া থাকেন মহা সৌভাগ্য। ইহকালে তাঁহারা হইবেন সম্মানিত ও সৌভাগ্যশালী, পরকালে তাঁহারা হইবেন স্থায়ী জান্নাতবাসী।

বৎস! ইহা আমার মুখের কথা নয়, ইহাতে রহিয়াছে, পবিত্র কোরআনের নিশ্চয়তা ও প্রতিশ্রুতি, আর জানিয়া রাখ, আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নহেন। যাহার যতটুকু পাওনা তাহাই তাহাকে পরিশোধ করা হইবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক।

বৎস! পবিত্র কোরআনের একটি সুরার কথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিৎ। এই সুরা প্রত্যেহ পাঠ করিলে তুমি ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হইবে এবং পাইবে অনেক পুরুস্কার আর অর্জন করিতে পারিবে এল্‌মে মারফাত, যদি তোমার ঈমান ঠিক থাকে করিতে পারিবে অসাধ্য সাধন। পবিত্র কোরআনের এই সুরার নাম "ছুরা মুয্‌যাম্মিল।"

এই সুরাটি শোনার আগে ইহার কিছু পূর্ব ইতিহাস শোন; আমাদের প্রিয়নবী হযরত আহম্মদ মোস্তফা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর ১৪ হাত লম্বা একটি কম্বল ছিল। একদিন মক্কার কোরাইশগন তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কুৎসা রটনা করিতেছিল। হযরত মনোক্ষুন্ন হইয়া কম্বল খানা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া শায়িত ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই সুরা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এবং তাঁহাকে "ইয়া আইউহাল মুযযাম্মিল" অর্থাৎ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি।" বলিয়া সম্বোধন করেন। এই জন্য এই সুরার নাম হইয়াছে সুরা মুয্‌যাম্মিল। এই সুরার মোট বিশটি আয়াত সম্পূর্ণ ভাবে শুনিতে, বুঝিতে ও অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর।

"সুরা মুয্‌যাম্মিল" এর বঙ্গানুবাদ

" হে বস্ত্রাচ্ছাদিত মোহাম্মাদ (সাঃ)!

তোমার প্রভুর এবাদতের জন্য রাত্রিতে দন্ডায়মান হও, কিন্তু অল্প, সমস্ত রাত্রি নহে, অর্ধরাত্রি কিম্বা তাহা হইতে কিছু কম, অথবা কিছু বেশী এবং পবিত্র কোরআন ধীরে ধীরে ও নিয়মিত পাঠ কর। নিশ্চয়ই আমি তোমার উপর শিঘ্রই সম্পূর্ণরূপে নাযিল করিব। নিশ্চয় রাত্রি জাগরন বড়ই আত্ম সংযম ও বাক্য সংশোধন করে। দিবাভাগে তোমার জন্য বহুবিধ কাজ কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং রাত্রিতে তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং তাঁহার দিকে ঝুকিয়া পড়। তিনি সর্ব দিকের প্রতিপালক, তিনি ব্যাতীত কোনই উপাস্য নাই; অতএব তাঁহাকেই কর্মকর্তারূপে গ্রহন কর। আর তাহারা যে পীড়াদায়ক কথা বলে তাহা সহ্য কর ও তাহাদিগকে উত্তমরুপে বর্জন কর। আর আমাকে ঐ সকল মিথ্যাবাদী ও মালদারগনকে বুঝিয়া লইতে দাও এবং তাহাদিগকে কিছু কাল অবকাশ প্রদান কর। নিশ্চয়ই আমার নিকট শিকল ও জলন্ত অগ্নিকুন্ড আছে এবং আছে কন্ঠরোধকারী খাদ্য ও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও পর্বত সমূহ ধ্বংশ হইয়া বালুকাস্তুপের ন্যায় হইয়া যাইবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে রাসুল রূপে পাঠাইয়াছি, যেরূপ ভাবে আমি ফেরাউনের নিকট হযরত মুশা (আঃ) কে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু ফেরাউন তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল তজ্জন্য আমি ফেরাউনকে ভীষন ভাবে পাকড়াও করিয়াছিলাম। তোমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অবিশ্বাস কর, কষ্ট দাও, তবে ঐদিন তোমরা রেহাই পাইবে না। সেদিন শিশুরাও পেরেশানিতে বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। আকাশ ফাটিয়া যাইবে, কিয়ামতের অঙ্গিকার পূর্ণ হইবে। নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের বিপদের সতর্কবানী। অতএব যাহার ইচ্ছা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর হোউক, অবলম্বন করুক স্বীয় প্রতিপালকের বানী সমূহ।

তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন যে, তুমিও তোমার অনুসারিগন রাত্রির তিন অংশের দুই অংশ, মাঝে মাঝে রাত্রির অর্ধাংশ এবং মাঝে মাঝে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ তোমাদের প্রভুর এবাদতে অতিবাহিত কর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু দিবা ও রাত্রির হিসাব রাখেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমরা সর্বদা এবাদত করিতে পারিবেনা তাই তিনি তোমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন। যতটুকু সহজ সাধ্য, ততটুকু কোরআন পাঠকর, তিনি আরও অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ পীড়িত ও অসুস্থ থাকিবে এবং কেহ কেহ রুজিরোজগারের আশায় আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য থাকিবে। এবং কেহ কেহ আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে, সুতরাং যতটুকু সহজ সাধ্য আপাতত তাহাই কর। নামায পড়, যাকাত দাও, হকদারগনকে দান কর। তোমরা নিজ নিজ মঙ্গলের জন্য সকল পূন্য বা সৎকার্য্য করিবে, তাহার জন্য

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান পাইবে। জানিয়া রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

বৎস! একটু ধৈর্য্য ধরিয়া খেয়াল করিয়া দেখ, আল্লাহ কিন্তু এই সুরার শেষভাগে অঙ্গিকার করিতেছেন যে, "তোমাদের যতটুকু সহজ সাধ্য, ততটুকুও যদি এবাদত কর, তাহা হইলেও আল্লাহ তওবার মাধ্যমে তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার বান্দাদের মধ্যে কেহ কেহ পীড়িত ও অসুস্থ থাকিবে এবং কেহ কেহ পেটের ধান্দায় রোজগারের আশায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, সেই কারনে কিন্তু রাত্রে সাধ্যমত এবাদত এর কথা বলিয়াছেন। এবং সর্বশেষে আল্লাহ মানুষকে রহমতের আশ্বাস দিয়াছেন যে, আল্লাহ বড়ই দয়ালু ও ক্ষমাশীল। এই আয়াতের মধ্যে মানব জাতির ধৈর্য্য ধারণ করার কথাও উল্লেখ আছে। কারণ ধৈর্য্য ধারণ করাও এবাদতের সামিল। ধৈর্য্য ধারণ না করিলে, মনে ক্রোধের সৃষ্টি হইতে পারে, প্রতিশোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে, অহংকারের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার ফলে মানুষ গুরুতর-পাপকার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, ঈমান নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

এই সুরায় মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা সাবধানে কার্য সম্পাদন কর, এবাদৎ কর, কোন কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিওনা, কারণ আল্লাহ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত দিকই দেখিতে পান। আর অসৎ, খারাপ, পাপকার্য্যের ও ব্যবহারের জন্য আল্লাহর নিকট রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। যেরূপ শাস্তি ফেরাউনকে দেওয়া হইয়াছিল, অবিশ্বাস করার কারনে।

অতএব বৎস! ঈমানকে দৃঢ় কর, আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলকে এবং পবিত্র কোরআনের বানীকে বিশ্বাস কর, সকল কার্য্যে তাহা বাস্তবায়ীত কর; তাহা হইলেই আল্লাহর ইচ্ছায় করিতে পারিবে অসাধ্য সাধন এবং অতিক্রম করিতে পারিবে অকাল মৃত্যুকে।

বৎস! জানিয়া রাখ, পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রতিটি মানুষের দরকার খাদ্য গ্রহন করা। যদি ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহন করা হয়, তাহা হইলে শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে আর বৃদ্ধি পাইবে শরীরের শক্তি। যদি প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহন না করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে মানুষ দুর্বল হইয়া পড়িবে, শরীর শুকাইয়া যাইবে এবং মানুষ চলাচল ও কাজকর্ম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

রুহ বা আত্মারও ঠিক তেমনিভাবে খাদ্য প্রয়োজন। আত্মার খাদ্য যদি সঠিক ও নিয়মিত ভাবে প্রদান না করা হয়। তাহা হইলে, মানুষের আত্মাও শুকাইয়া

যাইবে, আত্মার শক্তি কমিয়া যাইবে এবং পরিশেষে আত্মা রুগ্ন হইয়া পড়িবে। এখন হয়তো প্রশ্ন উঠিবে, আত্মার খাদ্য আবার কি?

বৎস! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এতক্ষনে হয়তো বুঝিতে পারিয়াছ যে, "আত্মার খাদ্য আল্লাহর জিকির করা এবং পবিত্র কোরআন পাঠ ও আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নামাজ, রোজা ও ইসলামের অন্যান্য বানী ও বিধান সমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। তুমি যখন একজন মোমেন মুত্তাকিন লোককে তোমার উল্লিখিত কার্য্যাবলীর দ্বারা খুশী করিতে পারিবে, তখন বিশ্বপ্রতিপালকও খুশীহইবেন।

বৎস! প্রত্যেহ নামায্ অন্তে কালেমা শাহাদৎ, কালেমা তৈয়বা, সুরা ফাতিহা, দরুদের মাহি এবং অন্যান্য দরুদ শরীফ বেশী বেশী করিয়া পাঠ করিবে। ইহাতে তোমার আত্মা শক্তিশালী হইবে, কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, আত্মা সর্বদা আলোকিত থাকিবে। বৎস এই দরুদে মাহি সম্পর্কে একটি অলৌকিক ঘটনা শোন।

"হযরত রাসুল (সাঃ) এর সময় একজন মোমেন ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দরুদ শরীফ পাঠ করিতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস ইহা শুনিয়া দরুদটি শিখিয়া ফেলে, এবং সর্বক্ষণ পাঠ করিতে থাকে। ক্রমে মৎসটির রোগ আরোগ্য হইতে থাকে, এবং তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করে। হঠাৎ কোন একদিন মৎসটি একজন ইহুদি জেলের জালে ধরা পড়িলে, ইহুদী মাছটি লইয়া বাড়ীতে যায়। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও মাছটি কাটিতে পারে না। অবশেষে ইহাকে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মৎসটি নির্বিঘ্নে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চার্যন্বিত হইয়া পড়িল এবং মৎসটিকে লইয়া হযরত রাসুল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল।

হযরত রাসুল (সাঃ) এর দোওয়ায় মাছটি বাকশক্তি লাভ করিল এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর হাবিব (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করিল।

ইহা শোনা মাত্র সেখানে ৭০ জন ইহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছিলেন এবং হযরত রাসুল (সাঃ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, তৎপর মৎসটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্ত কারণে এই দরুদে মাহি অর্থাৎ মাছের দরুদে বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল। ইহা পাঠ করিলে সুমধুর শোনা যায়।

এই দরুদ শরীফ দ্বারা সমস্ত নবী, রাসূল, ফেরেস্তা ও মুমিন ব্যাক্তিগনের জন্য রহমতের প্রার্থনা করা হয় বলিয়া এই দরুদ শরীফ পাঠকারী তাঁহাদের দোওয়া লাভ করিয়া থাকেন। এই দরুদ শরীফের ফযীলত ও শক্তি এত বেশী যে মানুষ চিন্তা শক্তি দিয়া তাহা কল্পনা করিতে পারেনা।

'দরুদে মাহি'

''আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন খাইরুল খালায়িকে আফযালুল বাশারি, শাফিউল উম্মাতি ইয়াওমল হাশরি, ওয়ান্‌নাশ্‌রি সাইয়াদিনা মোহাম্মাদিন বিয়াদাদি কুল্লি মালুমিল্লাকা ওয়া সাল্লিআলা জামিয়িল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিনা ওয়াল মালায়িকাতিল মূকারাব্বীন, ওয়ালাহিস্‌সালিহীনা ওয়ারহাম্‌না মায়াহুম বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

ইহার অর্থ হইল,''হে আল্লাহ! তুমি তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, হাশরে স্বীয় উম্মতগনের সুপারিশকারী, যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মাদ (সঃ) তাঁহার উপর তোমার সৃষ্ট রাজ্যে সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ রহমত প্রেরন কর এবং তোমার প্রেরিত নবী, রসুল ও তোমার প্রিয় ফেরেস্তাগনের ও ঈমানদার ব্যক্তিগনের উপর তোমার রহমত প্রেরন কর।'' **(নেয়ামুল কোরআন)**

বৎস। ইসলামে মানুষের চিন্তা কর্ম ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রহিয়াছে। এই কারনেই মানুষের মধ্যে কেহ কেহ পথভ্রষ্ট হইয়া আল্লাহর দীন ছাড়িয়া ভ্রান্ত পথে গমন করে। অথচ আসমান জমিন সমস্ত কিছুই আল্লাহর হুকুম মানিয়া চলে, চলে ইসলামের বিধান মান্য করিয়া, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহকে ভূলিয়া ইসলামের সাম্যের বানী ভূলিয়া স্যাটানিক র্ভাসেস গ্রন্থের রচয়িতা মুরতাদ সালমান রুশদীর মত ভ্রান্ত পথে গমন করিয়া আল্লাহর দয়া হইতে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ, নবী (সঃ) ও ফেরেস্তাগন সর্ম্পকে নানা প্রকার বির্তকের সৃষ্টি করে।

যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে কোরআনকে বা আল্লাহর বানীকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ, তাঁহার নবী এবং ফেরেস্তাগন সর্ম্পকে বিরুপ মন্তব্য করে, মানুষকে ভ্রান্ত ধারনা দেয়, কোরআনের সত্যতা সর্ম্পকে তর্ক–বির্তক করে, তাহারা অবশ্যই জাহান্নামে যাইবে। পবিত্র কোরআন ইহার সাক্ষ্য। কারন আল্লাহ ভঙ্গ করেন না তাঁহার অঙ্গিকার।

বৎস! জানিয়া রাখ, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা অন্য যে কোন জীবন ব্যবস্থার চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। ভ্রান্ত ধারনার বশর্বতী হইয়া বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং মানুষের বিবর্তন সর্ম্পকে সম্পুর্ন মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন চার্লস ডারউইন। ডারউইন বিবর্তন বাদ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার

মতে, ''মানুষ বিবর্তনের ফলে বাঁনর জাতীয় কোন প্রানী হইতে বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে।'' **(বিবর্তন বাদও সৃষ্টি তত্ত্ব'মুঃ আব্দুর রহীম, পৃঃ ৫০)**

বিবর্তন বাদ মিথ্যা নয়। কারন বহুপূর্বে মানুষ অনেক দীর্ঘ ছিল, প্রায় ৭/৮ হাত লম্বা মানুষ ও ছিল বলে জানা যায়। পূর্বেকার মানুষের আয়ু ছিল ৩০০/৪০০ বৎসর। পূর্বেকার মানুষের তুলনায় বর্তমান যুগের মানুষ দৈহিক আকারে অনেক ছোট। বিশ্বের কোন কোন দেশের মানুষ খুবই বেঁটে। তাহা ছাড়া আবার বিশ্বের কোন কোন দেশের মানুষ সাদা, এবং কোন কোন দেশের মানুষ কাল। সাদা এবং কাল নর–নারীর মিলনে সাদা বা কাল উভয় প্রকার সন্তানের জন্ম হইতেছে।

যুগের ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূর্খ লোক, অসভ্য লোক সভ্যতা নামক সূর্য্যের মুখ দেখিতেছে। মানুষের চিন্তা ভাবনারও অতীতের তুলনায় অনেক পরির্বতন হইতেছে। সুতরাং বিবর্তনের ফলেইতো মানুষ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। সূরা কাহাফ ৩৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''আমি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি প্রথমে মাটি হইতে, পরে শুক্র হইতে এবং পরিশেষে দিয়াছি মানুষ আকৃতি। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন, ''আমি তোমাদের যুগল হইতে পয়দা করিয়াছি তোমাদের পুত্র ও পৌত্রগনকে। আমি মিঃ ডারউইনকে বলিতে চাই, ইহা কি বিবর্তননয়?

বৈজ্ঞানিকগন বলেন, ''সব কিছুর ভার সাম্য রক্ষা করে, ''একটি বিরাট শক্তি।'' কে এই অদৃশ্য বিরাট শক্তি বা দি গ্রেট পাওয়ার?

আমি বলি, ইসলাম বলে ''তিনিই সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ।''

ডার উইনের বিবর্তন বাদ যদি সত্য হয়, তবে স্রষ্টার অস্তিত্বে কোন আঘাত লাগে না। প্রাথমিক ভাবে আল্লাহ মাটি দিয়া আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আদম ও হাওয়ার মিলনের ফলে মানুষের সৃষ্টি এবং বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই বর্তমান রূপান্তর। ইহা আল্লাহরই বিধান। বৎস! পবিত্র কোরআনের সুরা ইয়াছিন পাঠকর, এবং বুঝিতে চেষ্টা কর।

ডারউইনের মত অনেক বৈজ্ঞানিক আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ আল্লাহ মহা বৈজ্ঞানিক। অনেক মানুষই পবিত্র কোরআনপাকের উপর গবেষনা করিয়া সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, আর পৃথিবীতে খেতাব পাইয়াছেন বৈজ্ঞানিক রূপে।

আমি প্রশ্ন রাখি, মিঃ ডারউইন যে পবিত্র কোরআন বা অন্য কোন আসমানি কেতাব পড়েন নাই বা তাহার সূত্র ধরে গবেষনা করেন নাই, তাহারই বা প্রমান কোথায়?

বরং মিঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদ পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে, মিঃ ডারউইন পবিত্র কোরআনের আল্লাহর পবিত্র বানীকে একটু ঘুরাইয়া বলার চেষ্টা করিয়াছেনমাত্র।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ যদি সত্য হয়, তবে তাহার বক্তব্যের মধ্যে শ্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়, ইহাও সত্য। বিবর্তন সত্য, স্রষ্টাও মিথ্যা নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বিষয়টির মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

আল্লাহ পরম স্রষ্টা–রূপেই আছেন এবং থাকিবেন। ডারউইন হয়তো স্রষ্টার খোঁজ নাও পাইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির সন্ধানতো পাইয়াছেন। ইহাই বা স্বীকার করিতে আপত্তি কোথায়? আর ডারউইন যদি সৃষ্টি রহস্যই উদঘাটন করিতে পারেন, তবে তিনি স্রষ্টার সন্ধান পাইলেন না, ইহাই বা কেমন সত্যবাদিতা। ডারউইনের মতবাদ যদি একটি পূর্নাঙ্গ মতবাদ হয়, তাহার গবেষণা যদি একটি পূর্নাঙ্গ গবেষণা হয, তাহা হইলে তিনি নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াছেন, আর স্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়াছেন, কিম্বা গোপন করিয়াছেন অথবা চরম মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। কারণ ডারউইনের মতবাদের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা লুকায়িত আছেন। কারণ পবিত্র কোরআনের ''রব শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী।

ডারউইন যদি পবিত্র কোরআন না পড়েন বা বাইবেল না পড়েন কিম্বা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ্য পাঠ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, মানুষ বিবর্তনবাদের ফলে সৃষ্টি এই কথা কোথায় পাইলেন? আর কি দিয়েই বা তিনি গবেষণা করিলেন?

আল্লাহ সুরা কাহাফের ৩৭ আয়াতে বলিয়াছেন, ''তোমাদের মাটি ও পরে বীর্য্য বা শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।'' সুরা আল্ ইমরানের ৬ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি স্বীয় ইচ্ছায় জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছি।'' ইহাতেতো স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমেই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মানুষ প্রথমে মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের বীর্য্য বা শুক্র হইতে জরায়ুর মধ্যে আল্লাহ মানুষের আকৃতি গঠন করিয়াছেন,তাহাতে আত্মা দান করিয়াছেন, এবং পরে শরীর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাই তো বিবর্তন। আর আল্লাহই হইলেন সেই বিবর্তনকারী।

''ডাঃ হোয়াইট হেড বলেন, ''আল্লাহতালা একটি অসীম অস্তিত্ব এবং তিনি বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলেন, ''ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া। কোন গবেষণা ধর্মীয় মাহত্য ও দৃঢ়তর প্রবৃত্তির ফল।''

''মানুষ বর্তমান যুগে নৈতিক বিশ্বাসের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া বিলাতের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক টয়নবী বলিয়াছেন, ''মানুষের এই দূর্বল বিশ্বাসই চরম সত্যকে একটি বিশৃংখল কিছু মনে করার মূল কারণ।''

ইসলাম ধর্ম সেই কারণে মানুষের নৈতিক শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ফলতঃ আধ্যাত্বিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির এই ভুল হয় না। কারণ আত্ম জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের উৎস। কোরআন এবং হাদিস মানুষের এই জ্ঞান দান করে। আল্লাহ পাকের সঙ্গে, আল্লাহ পাকের পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয়, উপলব্ধি ও আত্মজ্ঞান ব্যতীত পূর্নভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নহে। আর সেই কারণেই শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও এলমে মারেফাত তাই মানুষকে জ্ঞান সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য হাতছানি দিয়া জানায় সাদর সম্ভাষণ।

অনেকের ধারণা সেন্ট টমাস একুইনাসকে পৃথিবীর সর্বকালের প্রথম শ্রেনীর বিশিষ্ট দার্শনিকদের অন্তুর্ভূক্ত করা যাইতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দার্শনিক একুইনাসের আলোচনার মূল ভিত্তি হইল এরিষ্টটলের আলোচনার পদ্ধতি ওধারা।

টমাস একুইনাস বিশ্ব প্রকৃতির রাজত্বের মধ্যে এক সুশৃংখল নিয়ম ও শ্রেণী বিন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কর্তা হইতে শুরু করিয়া নগন্যতম জীব পর্যন্ত সকলেই এক অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য কাজ সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। একুইনাসের মতে, ''প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রীক কল্যাণ সাধন করিতেছে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনিই ইহাকে নিয়ন্ত্রনও করিতেছেন।''

টমাস একুইনাস তাঁহার ''Regimine principum'' ও ''Rule of princes'' নামক গ্রন্থে আইনের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ''Law is an ordinace of reason for the common good, promulgated by God who has the care of a community.'' আইনের এই সংজ্ঞাটি হইতে দুইটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি Ordinance of reason বা যৌক্তিক বিধান, দ্বিতীয়টি Promalgated by God বা সৃষ্টিকর্তা দ্বারা প্রদত্ত। এ্যাকুনাসের রাজনৈতিক দর্শনে এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রন অত্যান্ত সহজভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় পন্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ট বলা হইয়া থাকে। তিনি God বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস

করিতেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা ''আ'রা–ফ'' এর ৫৪ আয়াতে বলিয়াছেন, ''তোমাদের রব আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র ছয় দিবসে, তারপর তিনি স্থির হন আরশে, তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসের আচ্ছাদন করেন, যেন একে অন্যের অনুসরণ করে, আর চন্দ্র, সূর্য্য, তারকাপুঞ্জ তাঁহারই আদেশের অধীনে, তিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সারা দুনিয়ার পালক। সুতরাং টমাস এ্যাকুইনাসের মতবাদ মিথ্যা নহে বা কল্পনা প্রসূতও নহে। টমাস এ্যাকুইনাস ১২২৫ খৃঃ নেপল্সের অন্তর্গত রোক্কা সিক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নেপল্স, রোম ও অন্যান্য নগরীতে বহুদিন অধ্যায়ন ও ভ্রমন করিয়া অসামান্য জ্ঞানার্জনকরিয়াছেন।

৪১০ খৃঃ অলারিক ও বর্বর গথরা রোমে লুঠতরাজ করিয়াছিল, সেই সময়ে রোমে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বিপদে পতিত হইয়াছিল। খৃষ্টানরা রোম সাম্রাজ্যকে পতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছিলনা। সমগ্র ইউরোপ হইতে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা পৌত্তলিকতাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। সেই সময়ে খৃষ্টান ধর্মের জীবনদাতা হিসাবে আগমন করেন দার্শনিক অগাষ্টিন।

তিনি ''De civitate Dei'' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি বাইশটি খন্ডে বাহির হইয়াছে। এবং বারটি খন্ডে ঈশ্বরের শহর গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। অগাষ্টিন রোমকে ঈশ্বরের শহর হিসাবে এক চমৎকার দর্শন দিয়াছেন। ইহা ঈশ্বরের প্রেমের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঈশ্বরের শহর ভালোর দিকে এবং পার্থিব রাষ্ট্র খারাপের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ একটি ন্যায়ের দিকে ও অন্যটি ক্ষমতার দিকে ধাবিত হয়।

ইংল্যান্ডের দার্শনিক টমাস হবস সৃষ্টিকর্তাকে মনেপ্রানে বিশ্বাস করিতেন। তিনি ইঞ্জিল কিতাব আয়ত্ব করিয়াছিলেন। হব্স বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বভাবতঃই অনেক রিপু বা উৎকৃষ্ট বাসনা থাকে, তিনি এ রিপুগুলিকে কমিয়ে বিরক্ত ও ঘৃনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। হব্সের মতে, ''ঈশ্বরের আইন ও সার্বভৌমের উপর কেহ কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারে না।

হব্স তাঁহার গ্রন্থে রাজাকে প্রাকৃতিক আইন, ঈশ্বরের আইন, শাসনতান্ত্রিক আইন ও রীতিনীতি মানিয়া চলিতে বলিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

ইংরেজ দার্শনিক বার্কের মতে, ''শাসনতন্ত্র ঐশ্বরিক ও নৈতিক অনুশাসনের অংশ বিশেষ। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

জার্মান দার্শনিক হেগেল এর মতে, ''রাষ্ট্র কর্তৃক আইন সৃষ্টি হইবে, কারণ রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সার্বজনীন ইচ্ছার প্রতিনিধি স্বরূপ এবং ইহা ঐশ্বরিক ইচ্ছাকেও প্রতিনিধিত্ব করে। আর ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্যই তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারে''। জার্মান দার্শনিক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

দার্শনিক টলষ্টয় ছিলেন অত্যান্ত ধার্মিক। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ছিল তাহার সুগভীর বিশ্বাস।

টলষ্টয় এতই ধার্মিক ছিলেন যে, ''কমিউনিষ্ট লেনিন তাঁহার ধর্মীয় মনোভাবকে সমালোচনা করিয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছিলেন।

ইবনে খালদুন ছিলেন একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ। তিনি ১৩৭৭ খৃঃ Prolegomen নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কায়রোতে থাকাকালিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি ''কিতাবুল ইবার'' বা সার্বজনীন ইতিহাস নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, ''যে কোন ধর্মীয় মিশন ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে সংহতি ব্যতীত কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যদি মিশন কৃতকার্য্য হয়, তবে সন্দেহাতীত ভাবে রাষ্টের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ধর্মকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন ক্ষতি হয় না। তবে একতা ও সংহতির অনুপ্রেরনায় ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।'' তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন আল্লাহই এই আশরাফুল মাকলুকাতের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। ইবনে খালদুন তাঁহার লেখায় ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন।

বৎস! সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি তোমার পূর্ণ বিশ্বাস আনয়নের জন্য বিশ্বের এই সকল মনিষিদের মতামত শুনাইলাম। ঠিক এই প্রয়োজনেই হিন্দু ধর্ম দর্শন সর্ম্পকে কিছু শোন।

হিন্দু ধর্মীয় দার্শনিকগণ বলেন, ''আদ্যাশক্তি'' অর্থ আসল শক্তি। পৃথিবী বা ত্রিভূবন বা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যিনি পরিচালনা করেন, তিনিই স্রষ্টা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা।'' এই তিনশক্তিকে তাঁহারা রূপ দিলেন, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। আবার সর্বশেষে ত্রিশূলে তিনটি মাথা দেখাইয়া তাহা সংযোগ করিয়াছেন একটি দন্ডে অর্থাৎ একের ভিতর তিন রূপে বা একের তিনটি রূপ এই ভাবে। কিন্তু একই সত্য। অর্থাৎ হিন্দুগণ বিভিন্ন দেব-দেবীর পুঁজা করিলেও সকল দেব-দেবী যে একই স্রষ্টার বিভিন্ন রূপ, তাহাই হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন। হিন্দুগণ প্রকৃত পক্ষে এক ঈশ্বরবাদেই বিশ্বাসী। কিন্তু বিভিন্ন দেব-দেবীর পুঁজা করা দেখিয়া অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। হিন্দু ধর্মের আরাধনার কোন সহজ সরল পথ

নাই। বরং খুবই জটিল এবং সেই কারণে সৃষ্টি কর্তার নৈকট্য লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। অপর দিকে ইসলাম ধর্ম সহজ ও সরল। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার ও নৈকট্য লাভের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ রহিয়াছে পবিত্র কোরআনে। প্রধানতঃ এই সমস্ত দিকগুলি চিন্তা ভাবনা করিয়াই হিন্দু ধর্ম গুরু বিখ্যাত ধর্মচিন্তাবিদ ডক্টর শিব শংকর ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছেন। এবং বর্তমানে ডঃ ইসলামুল হক নাম ধারনকরিয়াছেন।

বৎস! সমস্ত ধর্মের মূল ইসলাম এবং পৃথিবীতে শেষ ঐশী গ্রন্থ হিসাবে কোরআনকে বিশ্বাস, কোরআনের বিশুদ্ধতা ও অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই বা কোন তর্ক বিতর্কেরও অবকাশ নাই।

পবিত্র কোরআনের সুরা সমূহ একই দিনে অবতীর্ণ হয় নাই। যখনই যে সুরা অবতীর্ণ হইয়ছিল হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) নিজে এবং তাঁহার ছাহাবাগন ধারাবাহিক ভাবে তাহা হেফ্জ বা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। সময় সময় অবতীর্ন সুরা সমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব অবতীর্ন হওয়ার পর পরই লিখিয়াও রাখা হইত। সুতরাং প্রথম হইতে পবিত্র কোরআনের সঠিকত্ব বজায় রাখার জন্য হযরত নবী করিম (সঃ) দুইটি মাধ্যমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাদের একটি হইল হেফ্জকরণ এবং অপরটি হইল লিপিবদ্ধ করণ। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) দেহ ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবেই পবিত্র কোরআনকে সংকলিত, সংরক্ষিত ও হেফাযত করা হইত। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তৎকালে আরবের লোকেরা তেমন লেখাপড়া না জানিলেও মুখস্ত বিদ্যায় তাহারা খুবই পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের স্মরনশক্তি ছিল অত্যান্ত প্রখর।

বিভিন্ন ছাহাবীদের পবিত্র কোরআন মুখস্ত থাকায় ইহার নির্ভূলতা ও বিশুদ্ধতা যাঁচাই করিয়া দেখা খুবই সহজ হইয়াছিল। আবার যে সমস্ত সুরা লিখিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাও হেফ্জকারীর সহিত মিলাইয়া লইয়া বিশুদ্ধ করা হইত।

নবী (সঃ) এর দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর অর্থাৎ ৬৩২ খৃঃ পর্যন্ত ওহি অবতীর্ন হওয়া অব্যাহত ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়কে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখান যাইতে পারে। যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর হিজরতের পূর্ববর্তী দশ বৎসর এবং হিজরতের পরবর্তী তের বৎসর, এই সর্ব মোট তেইশ বৎসর ধরিয়া পরিত্র কোরআন শরীফ অবতীর্ন হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনের সুরা আলাক ১ হইতে ৫ আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, ''পড় তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাদের পয়দা করিয়াছেন। তিনি মানুষকে পয়দা করিয়াছেন এমন বস্তু হইতে যাহা সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। পড়, তোমার প্রভু

অত্যাধিক উদার ও সুমহান যিনি শিক্ষা দান করেন কলমের দ্বারা এবং তিনি মানুষকে তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাহা তাহারা ইতিপূর্বে জানিত না।'' এই সুরায় আল্লাহ মানুষের জ্ঞান লাভের জন্য কলমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক এই সুরায় কলমের কথা উল্লেখ করিয়া পবিত্র কোরআনের সুরা সমূহ লিখিয়া রাখিবার জন্য বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। হিজরতের পূর্ববর্ত্তী সময়ে পবিত্র কোরআনের যে সকল সুরা অবতীর্ন হইয়াছিল, সেই সকল সুরা সমূহ হযরত নবী করিম (সঃ) লিখাইয়া রাখিয়া তাহা সংরক্ষন করিতেন।

নবী করিম (সঃ) লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া পবিত্র কোনআনের সুরা সমূহ মুখস্ত করিয়া রাখিতেন। ঠিক তেমনি ভাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহাবাগণও সুরা সমূহ মুখস্ত করিয়া লওয়ার অভ্যাসটি সহজেই রপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তখনকার দিনে যে সমস্ত সুরাগুলি লিখিয়া রাখা হইত তাহাতে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে, যাহারা লেখক, তাহারা পবিত্র কোরআন মুখস্তকারী বা হেফ্জকারীদিগকে আমন্ত্রন জানাইয়া লিপিবদ্ধকৃত সুরা সমূহের ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেন। ঠিক তেমনি ভাবে হেফ্জকারীদের উচ্চারনে কিম্বা অন্য কিছুতে কোন ভুল ত্রুটি আছে বলিয়া সন্দেহ হইলে, যাহারা সুরা সমূহ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের নিকটে যাইয়া কিম্বা তাহাদিগকে আমন্ত্রন জানাইয়া শুদ্ধ ও সংশোধন করিয়া লইতেন।

হিজরতের পূর্বে ৬২২ খৃঃ যে চারিটি সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই চারিটি সুরায় পরিত্র কোরআন শরীফ যে লিখিত আকারে রক্ষনাবেক্ষন করা হইতেছিল তাহার প্রমাণ পবিত্র কোরআন শরীফেই রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআনের সুরা আবাসা-এ আল্লাহ বলিয়াছেন, ''ইহা সত্যেই হেদায়েত বাণী, অতএব যাহার ইচ্ছা তিনি ইহা মুখস্ত রাখুন। ইহা এখন এক পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ, যাহা সম্মানিত, মহা উন্নত, মহা পবিত্র। ইহা থাকে সেই সকল লেখকের হাতে, যাহারা মহৎ ও নেককার।''

পবিত্র কোরআনের সুরায়ে বোরুজ-এর ২১-২২ আয়াতে আরও উল্লেখ আছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, ''ইহা পবিত্র কোরআন যাহা লিপিবদ্ধ সুরক্ষিত ফলকে।'' সুরা ওয়াকিয়া-এ-আল্লাহ বলিয়াছেন, ইহা মর্য্যাদা সমুন্ন পাঠ'' যাহা সুরক্ষিত কেতাবে লিপিবদ্ধ, পবিত্র লোক ছাড়া যাহা কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা জগতের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ।'' (সুরা ৫৬, আয়াত ৬৭৭-৮০) ''তাহারা বলে, ইহাতো পুরানকালের কিস্‌সা কাহিনী, তাহা সে লেখাইয়া নেয়-যাহা সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে শোনানো হয়।''

তৎকালিন কোরাইশগণ বলাবলি করিত যে, "প্রাচীন কালের সমস্ত কিস্সা কাহিনী তাঁহাকে শোনানো হয়, আর তিনি নিজে কিম্বা অন্য কোন লেখক দ্বারা তাহা লিখাইয়া রাখেন।" তবে বৎস। জানিয়া রাখিবে, নবী করিম (সঃ) কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন। ইহা কোরাইশগনই স্বীকার করিয়াছেন যে, পবিত্র কোরআনের বাণী সমূহ লিখাইয়া নেওয়া হইত।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে, "আল্লাহর রসুল (সঃ) তেলায়াত করেন, পৃষ্ঠা সমূহ পবিত্র রাখেন, যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সঠিক ও সুদৃঢ় বাণী সমূহ।"

বৎস। নিশ্চয়ই এইবার অনুধাবন করিতে পারিয়াছ যে, হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর সময় কালেই তাঁহার উপর অবতীর্ণ বাণী সমূহ তিনি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতেন। "প্রফেসর হামিদুল্লা পবিত্র কোরআনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে সবাই একমত যে, যখনই হযরত (সঃ) এর উপরে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত নাজিল হইতো, তখনই তিনি তাঁহার সাহাবীদের মধ্যকার শিক্ষিত কাহাকেও অবতীর্ণ আয়াত সমূহ লিখিয়া নেওয়ার নির্দেশ দিতেন। শুধু তাহাই নয় অবতীর্ণ ঐ আয়াত সমূহ এযাবৎকাল প্রাপ্ত কোরআনের কোন্স্থানে লিপিবদ্ধ করিতে হইব, সঠিকভাবে তাহারও নির্দেশ দিতেন।" --------।

বর্ণিত আছে, লেখা হওয়ার পর নবীজী ঐ সকল লিপিকারদিগকে লিপিবদ্ধ আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শোনাইতে বলিতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, প্রতি রমজান মাসেই হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন শরীফ জিব্রাইল (আঃ)কে পাঠ করিয়া শোনাইতেন।" যে বৎসর হযরত মোহম্মাদ (সঃ) ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর রমজান মাসে দুই বার করিয়া জিব্রাইল (আঃ) হযরতের মুখের কোরআন পাঠ শুনিয়া লইয়াছিলেন। সেই কারনে প্রত্যেক রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলমান মোমেন ব্যক্তিগণ পবিত্র কোনআন খতম পাঠ করেন। এবং কেহ কেহ তাহা শ্রবন করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া নবী করিম (সঃ) এর সময় হইতেই প্রত্যেক নামাযে পবিত্র কোরআনের সুরা সমূহ পাঠ করার বিধান রহিয়াছে।

আল্লামা ইউছুপ আলী তাঁহার তফসিরের ১৯৩৪ নং টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "যখন এই সুরা নাজিল হয, তার আগে মক্কায় অবতীর্ণ মোট বিয়াল্লিশ অথবা পয়তাল্লিশটি সুরা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এবং পবিত্র কোরআনের সেই সব লিপি মক্কার মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত ছিল।"

বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্য ও বিবরণ হুইতে জান যায় যে, সম্পূর্ণ কোরআন চূড়ান্তভাবে সংকলনের বৈঠকে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর নিয়োজিত সেই

ওহি লেখক জায়েদ ইবনে সাবেত হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকে আরও অনেক খ্যাতনামা সাহাবীর উপস্থিতির কথাও অপরাপর বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করিবার জন্য চামড়ার কাগজ, চামড়া, কাঠের তখতা, উটের হাড়, লেখার উপযোগী নরম পাথর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হইত।

"হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর বিদায়ের পর ৬৩২ খৃঃ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরতের প্রধান অহী লেখক জায়েদ ইবনে সাবেতকে কোরআনের কপি নকল করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। জায়েদ ইবনে সাবেত তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন।" পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রাঃ) এর নির্দেশেও জায়েদ ইবনে সাবেত মদীনায় প্রাপ্ত তথ্য অর্থাৎ বিভিন্ন লেখকের লেখা পবিত্র কোরআনের সুরা সমূহ মূল কোরআনের সাথে মিলাইয়া দেখেন। এবং হাফেজগণের মুখে কোরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া সত্যতা যাচাই করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ এর আমলের সংকলিত কোরআনকে একত্রিত করিয়া একটি মাত্র কেতাবে রূপদান করেন। এবং মৃত্যুকালে তিনি উক্ত কোরআনখানি হযরত ওমর (রাঃ) এর কন্যা, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিধবা পত্নী হাফসা এর নিকটে রাখিয়া যান।

হযরত ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশন পুনরায় ঐ কেতাবখানির বিশুদ্ধতা ও সঠিকত্ব যথাযথভাবে তদানিন্তন হাফেজদের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহন করিয়া সর্ব সম্মতিক্রমে সঠিক ও বিশুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যান্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করায় বিভিন্ন দেশের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেরই মাতৃভাষা আরবী ছিলনা। সেই কারণে হযরত ওসমান (রাঃ) নির্ভুল পবিত্র কোরআন ঐ সকল দেশে সরবরাহ করিয়াছিলেন। প্রফেসার হামিদুল্লা বলিয়াছেন, "প্রধানতঃ এই কারনেই হযরত ওসমান (রাঃ) প্রেরিত এবং সঠিক ভাবে সংকলিত সেই কোরআনের মূলকপি আজও তাসখন্দ ও ইস্তাম্বুলে দেখিতে পাওয়াযায়।"

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহার সমস্তই পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন সংরক্ষনের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) কর্তৃক গ্রহীত দ্বিবিধ পদ্ধতির

কারণে সেই আমলের কোরআন শরিফ ও বর্ত্তমান যুগের কোরআন শরিফের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

সুতরাং বৎস! পবিত্র কোরআনের বাণী সমূহ সঠিক ও নির্ভূল বলিয়া জানিবে এবং জীবনের চলার পথের একমাত্র মূল্যবান ধন বলিয়া গন্য করিবে। অন্যান্য কিতাবের সাথে কোরআনের পার্থক্য হইল, কোরআনের বাণী সমূহের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয় নাই। পবিত্র কোরআন শরীফ পূর্বে যেরূপভাবে মানুষের বুকের মধ্যে স্থান লইয়াছিল আজও সেইরূপভাবে মানুষের বুকের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি লইয়া বিরাজ করিতেছে। সেই কারণে ইহার কোন বিনষ্ট বা ধ্বংস নাই।

বৎস! বৈজ্ঞানিক নিউটন শেষ জীবনে আল্লাহর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "There is a great power." আর আমি বলি, "সেই সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালীই হইলেন 'আল্লাহ', ইহাতে কোন সন্দেহনাই।"

বৎস! সংবাদপত্রে প্রকাশ বৈজ্ঞানিক নেইল আর্মষ্টং চন্দ্রে অবতরন করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রে ফাটল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কাবাসী রসুল (সঃ) এর নিকট আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেখানোর দাবী করিত। এই জন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশে চাঁদকে দুই টুকরা হওয়ার আদেশ দিলে চাঁদ দুই টুকরা হইয়া যায়।

হযরত ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করিম (সঃ) এর পবিত্র যুগে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হইয়া গিয়াছিল।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, "হুজুর (সঃ) এর যুগে চাঁদ ফাটিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।"

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) মক্কার লোকদের বলিয়াছিলেন, "সাক্ষী থাকিও যে, চাঁদ দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে।" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বর্ণনায়ও উল্লেখ আছে রাসুল (সঃ) এর যুগে মক্কায় অবস্থানকালে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনাঘটিয়াছে।"

বৎস! পবিত্র কোরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব এবং ইসলাম সমস্ত মানুষের সুন্দরতম পবিত্র ধর্ম। ইসলাম কোন নূতন ধর্ম নয়। এই ধর্ম পৃথিবীতে হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এবং ইহা সর্বযুগোপযোগী ধর্ম। এই ধর্মের আলোতেই মানুষের আত্মা আলোকিত হয়।

প্রিয় নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ''আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আমার সাফাআত হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হইতেছে, অত্যাচারী বাদশাহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে ধর্ম–কর্মে যাহারা অনর্থ ও বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সীমা লংঘন করে এবং যাহারা বেদাতী করে।

প্রিয় হাবিব (সঃ) আরও বলিয়াছেন, অত্যাচারী বাদশাহ পরলোকে কঠিন শাস্তিভোগ করিবে। হযরত নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, ''পাঁচ প্রকারের লোকের প্রতি আল্লাহতালা খুবই অসন্তুষ্ট। আল্লাহতায়ালা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পৃথিবী হইতেই তাহাদের শাস্তি আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন। ইহা ছাড়া দোজখের কঠিন শাস্তিও তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। উক্ত পাঁচ প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম হইতেছে, ঐ সকল শাসক, যাহারা স্বীয় অধিনস্থ লোকের কাছ হইতে নিজের প্রাপ্য ষোল আনা আদায় করিয়া নেয়, কিন্তু তাহাদের প্রতি সুবিচার করেনা এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করেনা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে ঐ সকল সরদার, জনসাধারণ যাহার অনুসরন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা তাহাদের অনুসরনকারীদের মধ্যে সবল ও দূর্বলকে এক নজরে দেখেন না, বরং সবলদের পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে, যাহারা শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া শ্রমিকের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে কাজ বুঝিয়া পাওয়ার পর তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দেয় না।

চতুর্থ শ্রেণীর লোক হইতেছে, যাহারা নিজেদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে আল্লাহতালার বিধানমত চলার জন্য হুকুম করেন এবং তাহাদেরকে ধর্মের বিধান শিক্ষা দেয় না আর তাহাদের খাওয়া পরার বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেয় না বা চিন্তা ভাবনাকরেনা।

পঞ্চম শ্রেণীর লোক হইতেছে, যাহারা স্বীয় স্ত্রীর দেন মোহরের বিষয়ে তাহার প্রতিঅন্যায়আচরণকরে।''

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ''শাসনকর্তা সৎই হোক আর অসৎই হোক, আমি তাহাদের পছন্দ করিনা। এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, ''আমি আল্লাহর নবীর (সঃ) মুখে শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন সুবিচারক এবং অত্যাচারী সর্ব প্রকার শাসনকর্তাদের একত্র করিয়া পুলসিরাতের উপর দাঁড় করানো হইবে। তারপর আল্লাহতালা পুলসিরাতকে হুকুম করিবেন, ''একবার ইহাদের ঝাঁকি দাও। যাহারা বিচার মিমাংসায় জুলুম করিয়াছিল, কিম্বা ঘুষ গ্রহনপূর্বক অন্যায় বিচার করিয়াছিল অথবা এক পক্ষের কথা মনোযোগের সাথে শুনিয়াছিল, আর অপর পক্ষের কথা শোনে নাই, সেই ঝাঁকিতে তাহারা পুলের

উপর হইতে ছিটকে দোযখে পড়িয়া যাইবে। আর সত্তর বৎসর ধরিয়া গড়াইতে গড়াইতে দোযখের গভীরতম গহব্বরে যাইয়া ঠোকিবে। আর সেই জায়গায়ই হইবেতাহাদের স্থায়ী বাসস্থান।" **(কিমিয়ায়ে সাদাত)**

বৎস! আল্লাহ বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কূট ষড়যন্ত্রের কারণে, উক্ত "কূট ষড়যন্ত্র" উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করিয়া থাকে।"

(সূরা—ফা—তির, আয়াত ৪৩)

পরম করুনাময়ের এই বানীর অনেক দৃষ্টান্ত বহপূর্ব হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। অল্প দিনের একটি ঘটনা দ্বারা একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খবর "সাপ্তাহিক আরাফাত" ২৮শে সংখ্যা, বাং ৭ই ফাল্গুন ১৩৯৬ ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, ২২শে রজব। "মক্কা মোকাররম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আযবারুল আলমে ইসলামী" পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী সম্প্রতি সাইরেরিয়া হইতে ইসলামের মুলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান সংগঠনগুলির পরিকল্পনা ব্যার্থহইয়াছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তাহারা যে ধর্মযাজকগনকে সাইরেরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যাগরিস্ট অংশ ইসলাম কবুল করিয়াছেন। উক্ত সংগঠনগুলি ৬৪৫৩ জন ধর্ম যাজকের এক বিরাট দলকে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া সাইবেরিয়ার রাজধানী নামরুদিয়ায় প্রেরন করিয়াছিলেন, সেখানকার মুসলিমদের শিরায় শিরায় সম্পৃক্ত ইসলাম ধর্মের মূল উচ্ছেদ করার জন্য।

সাইবেরিয়ায় পৌছিয়া তাহারা প্রথমে সেখানকার স্থানীয় ভাষা আয়ত্ব করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তাহারা ইসলামী লিটারেচার স্টাডি করার সুযোগ পান। তার ফলে ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাহারা এমনভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে, অবশেষে তাহাদের অধিকাংশ খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহন করেন। ফলে সেই অঞ্চলটি যেখানে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাদের পাঠান হইয়াছিল, এখন তাহা ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রে পরিনত হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য হইল এই যে, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় যদিও তাহাদের পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ষ্টাডি করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কেবলমাত্র ইসলামের বিকৃত শিক্ষাগুলি সম্পর্কে তাহাদের অবহিত করা হইয়াছিল।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলি তাহারা তখনই অনুধাবন করিতে সক্ষম হন, যখন তাহারা তাহাদের কর্মক্ষেত্রে সাইবেরিয়ায় উপনীত হইয়া, ইসলামের মূল গ্রন্থ্গুলির সরাসরি পড়াশুনা করার সুযোগ পান।

সাইরেরিয়ান মুসলিমদের এক জিম্মাদার সংগঠন (আল্‌জামিয়াতুল ইসলামিয়াতে আদবুনী) এর পর রাষ্ট্র বিষয়ের সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ ফানী সনিউহ মিশরে প্রতিষ্ঠিত "দাওয়াতে ইসলামী" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রিপোর্ট পেশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বিশ্বচার্চ সংগঠনের" সাহায্যে খৃষ্টান সংগঠনগুলি গত কয়েক বৎসরে সাইরেরিয়ায় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেও রাজধানী নামরুদিয়ায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য ৬৪৫৩ জন লোককে প্রশিক্ষণ দেয়।

এতদুদ্দেশ্যে তাহারা আফ্রিকার বংশোদ্ভুত উচ্চ শিক্ষিত লোকদের বাছিয়া নেয়, যাহাতে সেখানে পৌছিয়া সেখানকার লোকদের কাছে তাহারা অপরিচিত মনে না হয়।

তাহাদের এই নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করা হয় যে, সেখানে পৌছিয়া তাহারা সাইরেরিয়া ও আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে দক্ষতা অর্জন করিয়া সেখানকার সমাজের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের কাজ শুরু করিবেন।

ধর্ম যাজকদের এই দল নির্দেশানুসারে সময়ে সময়ে অতি সন্তর্পণে সাইরেরিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে এবং রাজধানী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। এমনকি তন্মধ্যে শত শত জন এই দেশের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটও হাসিল করিয়াছে।

উক্ত ধর্ম যাজকদের সংখ্যাগরিষ্ট "কোয়াদবুসী" গোত্রের লোকদের মধ্যে আসিয়া বসবাস করেন। এই গোত্র হইল সেই গোত্র যাহারা সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে এবং অদ্যাবধি পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে দৃঢ়তার সহিত ইসলামী শিক্ষাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যখন মুসলিমরা উক্ত ধর্মযাজকদের আগমন ও তাহাদের উদ্দেশ্যের কথা অবহিত হইল, তখন তাহারা অকপট হৃদয়ে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে যেমন, কোনজামা, কাকাতা, সানকোলা, কাতালী ইত্যাদিতে সর্ব ধর্মের কনফারেন্স সভার আয়োজন করে। যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে খোলাখুলি বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কনফারেন্স গুলিতে খৃষ্টান ধর্ম ভয়ানক ভাবে ব্যার্থ হয় এবং উক্ত ধর্মযাজকগন কোন একজন অখৃষ্টানকেও প্রভাবিত করিতে সক্ষম হন না। বরং তার বিপরীত এই হইল যে, উক্ত ধর্মযাজকগণের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলিম হইয়া গেলেন। তাহারা সাইবেরিয়ায় ইসলামী সংগঠনগুলির সাথে যুক্ত হইয়া ইসলাম প্রচারকেপরিনতহইয়াছেন।"

বৎস! পবিত্র কোরআন আল্লাহর পবিত্র বাণী। এবং ইহা সম্পূর্ণ সঠিক এবং অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে। কোন মানুষ তাহার পূর্বের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিয়া, তওবা করিয়া পবিত্র কোরআন পাঠ পূর্বক আল্লাহর দ্বীনে ফিরিয়া আসিলে এবং আল্লাহর হুকুম মান্য করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে সৎ স্বভারের পূর্ণজন্ম হইবে, তাহার আত্মা পুনরায় কালিমা মুক্ত হইয়া উজ্জল হইয়া উঠিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আল্লাহর আদেশ নির্দেশ মোতাবেক নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কার্য্যভার সম্পাদন করিয়া যাইতেছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি সব কিছুকে রূপদান করিয়া তাহাদের পথ নির্দেশ করিয়াছেন।''

আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত বস্তু ও শক্তি একত্রিত হইয়া যে মহাশক্তির সৃষ্টি করে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ স্বভাব. প্রকৃতি বা ইংরাজীতে Nature বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে হইতেই পরম করুনাময় আল্লাহতালা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রটোন, নিউট্রোন, অণু ও পরমানু এবং বহু শক্তির কণা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নিজ নিজ স্বভাব ও গুনের অধিকারী করিয়াছেন।

যাহার ফলে পৃথিবীতে অগনিত মৌলিক পদার্থ রহিয়াছে। তাহাদের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বেশীর ভাগই এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াই গিয়াছে।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর বৃহৎ শক্তির ক্ষুদ্রতম শক্তিগুলি কিভাবে একে অপরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষন করিতেছে এবং সুশৃংখল ভাবে নিজ নিজ অবস্থানে বা কক্ষে থাকিয়া আল্লাহর হুকুম পালন করিতেছে, তাহা ভাবিতে সত্যই অবাক লাগে। বৎস! একটু ভাবিয়া দেখ, পৃথিবী কিভাবে আল্লাহর আইন মান্য করিয়া সূর্য্যেরচারিদিকেঘুরিতেছে।

বৎস! ''অংক শাস্ত্রের শ্রডিঞ্জার সমীকরনের সাহায্যে ইলেট্রন বিন্যাস করা হয়।'' ঐরূপ শাস্ত্রগত বিধি মোতাবেক সুষ্ঠভাবে সুবিন্যাস্ত হইয়া পরমানু গঠিত হওয়ার বিষয়কে, কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি বলিতে পার? সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব এই বিংশ শতব্দীতে, বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও বিজ্ঞান বোবা! আর বৈজ্ঞানিকগণও বোবা মানুষের মত আঁ–উঁ করিতেছে। কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শুধুমাত্র কি? এবং কোথায়? কিভাবে? ইত্যাদি প্রশ্নই করিয়া চলিয়াছে। বৎস! পবিত্র কোরান সর্ব বৃহৎ বিজ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

আর বিশ্বাস রাখিবে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং সর্বময় কর্তা। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে পৃথিবী, আকাশ, বাতাস মহাকাশ, গ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্টির বিষয়, গুপ্ত তত্ত্ব বা ভেদ কিন্তু স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। আর যিনি পবিত্র কোরআন বিশ্বাস করিয়াছেন এবং যতটুকু বুঝিয়াছেন, আল্লাহ তাহাকে ততটুকুই জ্ঞান ও সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। কারণ আল্লাহ প্রত্যেকেরই তাহার ন্যায় সঙ্গত পাওয়ানা দান করেন, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

''আমেরিকার ভয়েজার–১, দ্বারা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, শনি গ্রহের কোন কোন বলয় একে অপরের সঙ্গে জড়াইয়া বা পেচাইয়া রহিয়াছে, যাহা পদার্থ বিজ্ঞানের শাস্ত্র গত নিয়ম বিরোধী।'' আর পবিত্র কোরআনের আল্লাহর বাণী হইতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, অনুধাবন করা যায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির সুমহান উদ্দেশ্য লইয়াই পরম দলালু আল্লাহতালা বিভিন্ন মৌল হইতে পরমানু সৃষ্টি ও তাহাদের গতিপথ, ধর্ম নির্ধারন করিয়া দিয়াছেন যাহা তাহারা সর্বক্ষন মান্য করিয়া চলে। বৎস! নিজস্ব বিবেক দিয়া একটু ভাবিয়া দেখ, আধুনিক বিজ্ঞান আর পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করিতে পারিবেনা, বরং আবিষ্কারের পথ নির্দেশক, সহায়ক গ্রন্থ্য হিসাবে ভক্তি ভরে বুকে জড়াইয়া ধরা উচিৎ। কারণ মানুষ যাহাতে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জানিতে ও বুঝিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াইতো সমস্ত বস্তুর গুনাগুন সম্পর্কে আল্লাহ আদমকে জ্ঞান দান করিয়া ফেরেস্তাগণকে সিজদা করিতে বলিয়াছিলেন। আর তখন একমাত্র ইবলিশ ব্যাতীত সমস্ত ফেরেস্তা আদমকে ঐ জ্ঞানের জন্যই সেজদা করিয়াছিল এবং আল্লাহর হুকুম পালন করিয়াছিল।

বৎস! আল্লাহর মানব শরীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে এইবার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের আশ্চর্য্য খবর শোন। (খবর, ''দৈনিক ইত্তেফাক'' ১৬৩ তম সংখ্যা, ১১ই ও ১২ই জুন ১৯৯০, ২৭ ও ২৮শে জৈষ্ঠ, সোম ও মঙ্গলবার ১৩৯৭। ইউ, এস, নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট হইতে নিয়াজ মোরশেদের সৌজন্যে) ''৩৭ বৎসর পূর্বে জেমস ডি, ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ডি, এন, দেহের প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রনকারী উপাদান বা দ্বৈত প্যাচ বা ডবল হেলিক্স আবিষ্কার করেন। উহার পর হইতেই বিশ্বের দেশে দেশে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রাণী জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এই উপাদানটি লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

অতি সম্প্রতিকালে তাহারা মানুষ তথা প্রাণীর জীবন, মৃত্যু ও রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে ডি, এন, এ এর প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হইতে শুরু করিয়াছেন। ডি, এন এর দ্বৈত প্যাঁচের সহিত দন্ডাকার এক ধরনের উপাদান লাগিয়া থাকে বিজ্ঞানের জেনেটিক্স শাখায় উহাকে বলা হইয়াছে জিন। এই জিন প্রাণীর

বংশগতির ধারক ও বাহক। বিগত কয়েক বৎসরের রাসায়নিক গভেষণার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকগন জানিতে পারিয়াছেন যে, এই জিন শুধু যে, মাসকুলার ডিসথ্রপির মত শুধু মারাত্মক বংশগত রোগেরই কারন তাহা নহে, উহা হৃদরোগ, এমফাইসেমা এবং ক্যানসারের মত বংশগত নয় বলিয়া পরিচিত এমন অনেক রোগ সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। মানুষের শরীরে ৫০ হাজার হইতে এক লক্ষ জিন থাকে। মাত্র ৫ বৎসর পূর্বেও উহাদের মাত্র কয়েকটিকে বৈজ্ঞানিকগণ চিহ্নিত করিতে পারিতেন। কিন্তু নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া এখন তাহারা ১৮শরও বেশী জিন সনাক্ত করিতে পারেন। বিশ্বব্যাপী এখন ৫ হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক জেনেটিক্স এর উপর গবেষনা করিতেছেন এবং প্রায় প্রতিমাসেই তাহারা নূতন নূতন ফলাফল প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীকে চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। গত মার্চ(১৯৯০)মাসে ইউটাহ বিশ্ব–বিদ্যালয়ের গবেষকগণ এমন একটি ক্রটিপূর্ন ডি,এন,এর সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা মলাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। গত এপ্রিল(১৯৯০)মাসে লস এঞ্জেলস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সান এ্যানটোনিওস্থ টেক্সাস হেলথ সায়েন্স সেন্টারের গবেষকগন দাবি করিয়াছেন যে, তাহারা এমন এক জিন এর সন্ধান পাইয়াছেন, যাহা মানুষকে মদাসক্তি বা কোহলিজমের দিকে লইয়া যাইতে পারে।

জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে নবনব আবিষ্কারের এই ধারা আগামীতে জোরদার হইবে বলিয়াই মনে হয়। কারন আগামী বৎসর গুলিতে এই ক্ষেত্রে ব্যয় বিপুলভাবে বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্‌থ এন্ড এনার্জি ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে তিন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করিবে আগামী ১৫ বৎসরে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানতো আছেই।

এখন অধিকাংশ রোগেরই চিকিৎসা শুরু হয় সাধারনতঃ রোগের লক্ষন প্রকাশ পাইবার পর। কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো চিকিৎসকগন রোগের লক্ষন প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্বেই জানিতে পারিবেন কোন্ জিন বা কোন জিন এর ক্রটির কারনে কোন রোগের সৃষ্টি হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো তাহারা রোগের সম্ভাবনা নির্মূল করিতে সমর্থ হইবেন।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন গবেষক মাইকেল হেডেন বলেন,''আমরা সম্পুর্ন নূতন ধরনের ঔষধের সন্ধান করিতেছি। সেই ঔষধ হইবে প্রতিরোধমূলক। আমরা আশা করিতেছি,'রোগের সম্ভাবনা নিরুপন ও সেই সম্ভাবনা নির্মূলের জন্য আমরা জিনকে ব্যবহার করিতে পারিব।''

বিভিন্ন প্রাণীর উপর গবেষনা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, উহার ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগন ধারনা করিতেছেন, সেই দিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন

তাহারা সম্ভাব্য রোগীদের উপর জিন থেরাপি চালাইতে পারিবেন। অর্থাৎ ডি, এন, এর ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া জিনের ত্রুটি সারাইয়া তুলিতে পারিবেন।

শুধু মানুষ নয়, সকল জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের দেহ গঠিত হইয়াছে অসংখ্য কোষ বা সেল এর সমন্বয়ে। কোষকে বলা যাইতে পারে প্রানের মৌলিক একক। অত্যান্ত ক্ষুদ্র অনুবীক্ষনিক এই কোষের মধ্যে অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ছাড়াও থাকে, ক্রোমোজম এবং প্রটিনের ''কারখানা'' ক্রোমোজম জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রন করে। এই ক্রোমোজমেরই মূল উপাদান ডি, এন, এ বা ডি অক্সিরিবোনিউক্লিক এ্যাসিড। জীব কোষে ক্রোমোজম থাকে জোড়ায় জোড়ায়। প্রতি জোড়ার একটি আসে মাতার নিকট হইতে অন্যটি আসে পিতার নিকট হইতে। মানুষের প্রতি কোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম। জীবদেহের প্রান টিকাইয়া রাখার ক্ষেত্রে প্রোটিন এবং নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ডিম এন, এ,কে বলা যাইতে পারে, এই সব রাসায়নিক উপাদান ও প্রোটিন উৎপাদনের 'নীলনক্সা' বা নিয়ন্ত্রন শক্তি।

ক্রোমোজমে ডি,এন,এ, থাকে দ্বৈত' প্যাঁচ বা ডবল হেলিক্স আকারে। এই দ্বৈত প্যাঁচ আকৃতির ডি, এন,এর কিছু প্রসারিত অংশের নাম 'জিন'।

জিনগুলি জীব কোষের প্রোটিন উৎপাদনের সংকেত বা নির্দেশ বহন করে। ভ্রুনাবস্থায় বা জন্মের পরে কোন দূর্বিপাক বা বিপর্যয়ের ফলে যদি কোন জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উহা প্রোটিন উৎপাদনের যে, সংকেত বা নির্দেশ বহন করিবে তাহা হইবে ত্রুটিপূর্ণ। স্বভাবতই ত্রুটিপূর্ন নির্দেশের ভিত্তিতে কোষের প্রোটিন কারখানা যাহা উৎপাদন করিবে, তাহাও হইবে ত্রুটিপুর্ন। এই ত্রুটি যুক্ত প্রোটিনই শেষ পর্যন্ত দেহকে লইয়া যায় রোগ ব্যাধির দিকে।

মানুষ যদি রোগাক্রান্ত হইবার পূর্বেই কোন পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারে তাহার দেহে ত্রুটিপূর্ন ডি,এন,এ বা জিন আছে, তাহা হইলে সে আশু চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ ভোগের যন্ত্রনা এড়াইতে পারিবে।

বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ন জিন এর সন্ধান পাওয়া তুলনামূলক ভাবে সহজ। বিজ্ঞানীগন যদি কোন রোগের জন্য দায়ী বিদ্রোহী বা ত্রুটিপূর্ন প্রোটিনকে চিহ্নিত করিতে পারেন, যেমন করিয়াছেন, এ্যাপোলাইগো প্রোটিন–বি,বা আলফা–১ এ্যানিট ট্রপসিনকে, তাহা হইলে তাহারা উক্ত প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষন চালাইতে চালাইতে উল্টাদিকে অগ্রসর হইতে পারেন দায়ী জিনটিকে সনাক্ত করার জন্য। কিন্তু সমস্যা হইতেছে, অধিকাংশ জিনঘটিত রোগের ক্ষেত্রেই

গবেষকগন দায়ী প্রোটিনটিকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই যে, প্রোটিনটি একেবারেই অনুপস্থিত না উপস্থিত থাকিলেও আছে ক্রটিপূর্ন অবস্থায়। সুতরাং দায়ী জিনটিকে সনাক্ত করা ছাড়া তাহাদের উপায় নাই। কাজটি এখনও অনাবিস্কৃত এক মহাদেশের অপরিচিত নগরীতে এক অজানা সড়ক খুজিয়া বাহির করার মতই কঠিন। তাই বলিয়া বিজ্ঞানীগন বসিয়া নাই। এই কঠিন প্রায় অসম্ভব কাজটি সম্ভব করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।''

বৎস! আল্লাহর কারুকার্য্য সর্ম্পকে আর একটি বৈজ্ঞানিক গবেষনার ফলাফল উদাহরন স্বরূপ শোন।

[খবর দৈনিক ইনকিলাব, ৯ই জুলাই ১৯৯০, ২৪শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৯৭ সাল বাং]

লন্ডন, ৮ই জুলাই (সিনহুয়া)।''দি ল্যানসেট ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগন মানুষ ও প্রানীর মগজে এক ধরনের অস্বাভাবিক প্রোটিনের খোঁজ পেয়েছেন। এই প্রটিনকে স্পঞ্জিফরম এনসেফালোপ্যাথিস বা মাতলামো বেদনা রোগ বলা হয়। পশুদের বেলায় এই রোগ দেখা দিলে তাকে ম্যাড কাউ ডিজিজ বা পাগলা গরু রোগ বলে।''

বৎস! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যে রহস্য লুকায়িত আছে, আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ বৈজ্ঞানিক তার সামান্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। মানুষ নিত্যনতুন তথ্য ও ঔষধ পত্র আবিষ্কার করিতেছেন, আর আল্লাহও পৃথিবীতে নিত্য নতুন সমস্যার অবতারনা করিতেছেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যাইতে পারে, পূর্বে এইডস রোগ হয়তো পৃথিবীতে ছিল কিন্তু বৈজ্ঞানিকগন আবিস্কার করিতে পারিয়াছিলেন না। অথবা পূর্বে পৃথিবীতে এইডস রোগ হয়তো ছিল না, কিন্তু মানুষের নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে, আল্লাহও নিত্যনতূন রোগ ব্যাধিরও অবতারনা করিতেছেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে পৃথিবীতে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপায় এবং রোগ ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন গাছপালা, লতাপাতা, বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার দ্বারা মানুষের রোগব্যাধি নিরাময় এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগন তাহার কতটুকু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন? এইডস এবং ক্যান্সারের মত রোগ ব্যাধির ঔষধ বৈজ্ঞানিকগন এই বিজ্ঞানের চরম ইন্নতির যুগেও আবিষ্কার করিতে পারেনাই।

বৎস! একটি কথা ভাবিয়া দেখ, যাহারা সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে কিছু জানেনা, বুঝেনা, তাহাদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যাহারা শিক্ষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সমস্ত

জ্ঞানী ব্যাক্তি ও বৈজ্ঞানিকগন কেমন করিয়া সৃষ্টিকর্তাকে জানিয়াও জানে না বা বুঝিয়াও বুঝে না। বৎস! লেনিন, ডারইন এবং স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থের রচয়িতা সালমন রুশদী প্রভৃতি ব্যাক্তিগনের আল্লাহ সম্পর্কে নবী করিম (সঃ) ফেরেস্তাগন এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে ধারনা সম্পূর্ণ ভুল।

তাহারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া মানুষকে করিয়াছে বিপথগামী, সৃষ্টি করিয়াছে নানাবিধ জটিলতা। তেমনিভাবে নিজেদের জন্য ও অন্যের জন্য আনয়ন করিয়াছে দূর্ভাগ্য এবং আল্লাহর নিকট হইয়াছে গুরুতর অপরাধী কারন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন, " কোরআনের বাণী মিথ্যা নহে। যদি কেহ মিথ্যাভাবে, তাহা হইলে ঐরকম একটি সুরা বা আয়াত আর সৃষ্টি হইলনা কেন?

বৎস! পবিত্র কোরআন যে সমস্ত আসমানী কেতাবের শেষ ধর্মগ্রন্থ তাহার প্রমান পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে কি আল্লাহতালা বর্ননা করেন নাই?

বৎস। পবিত্র কোরআনে পূর্বেকার সমস্ত ধর্মগ্রন্থের বর্ননা বা আসমানী কিতাবগুলির বর্ণনা আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং পবিত্রকোরআন পাকে আল্লাহর বর্ননা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন শরীফই সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী বা রাসুল।

বৎস! হযরত আহম্মদ মোস্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) যথার্থই বলিয়াছেন, "আমার পর আর কোন নবী আসিবেন না।" ইহার অর্থ আর কোন আসমানী কেতাবও কাহারও উপর নাজিল হইবেনা। সুতরাং ইহাই পরিষ্কার যে, পবিত্র কোরআনই সমগ্র মানবজাতির সর্বশেষ আসমানি কিতাব এবং ইসলামই সমগ্র মানব জাতির একমাত্র ধর্ম।

ইসলামে আছে সুষ্ঠ অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠ বিলি বন্টন ব্যবস্থা, আর প্রত্যেক মানুষকে তাহার ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও ন্যায্য পাওয়ানা পরিশোধ করার বিষয়ে রহিয়াছে জোর তাগিদ।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। ধনী ও গরীবের মধ্যে নাই কোন ভেদাভেদ। ইসলামে যাকাতের বিধান আছে, আছে ছাদকা, ফিতরা ও সাহায্য করার বিধান। "লেলিন টলষ্টয়কে ধর্মভীরু কাপুরুষ বলিয়াছেন। এবং ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হইয়া লেলিন বলিয়াছেন, "ধর্ম ভিক্ষা বৃত্তিতে উৎসাহিত করে —— ইত্যাদি।"

বৎস! ইসলাম কিন্তু খাটিয়া খাওয়া পছন্দ করে, ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করে না। কারন আমাদের নবী (সঃ) এর শিক্ষা বা আদর্শ হইল;

" নবীর শিক্ষা,
করনা ভিক্ষা,
মেহনত করো সবে।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তাহার ভাইয়ের উপর কোন প্রকার জুলুম করিতে পারে না এবং তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারে না। আর যে তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের অভাব পুরন করিবে, আল্লাহ তাহার অভাব পুরন করিবেন।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দূর করিবেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁহার দুঃখ দুর করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি ভুলিয়া যাইবেন বা গোপন রাখিবেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁহার দোষত্রুটি গোপন করিয়া রাখিবেন। **(বুখারী ও মুসলীম)**

বৎস! প্রিয় নবী (সঃ) আরও বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, " হে সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা কর নাই।" সে বলিবে, " হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন যে, আমি আপনার সেবা করিতে আসবো? আপনিতো সারা বিশ্বের প্রতিপালক।" আল্লাহ বলিবেন, আমার অমুক বান্দার রোগ হইয়াছিল, তুমিতো তাহা শুনিয়াছিলে, অথচ তুমি তাহার সেবা করিতে যাও নাই। তুমি কি জানিতে না যে, তুমি যদি সেবা করিতে যাইতে, তাহা হইলে তুমি আমাকে সেখানে পাইতে।" (মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল (সঃ) বলিয়াছেন, " সর্বোত্তম দান হইল, কোন ক্ষুধার্তকে পেট পুরিয়া খাওয়ানো।" **(মেশকাত)**

বৎস! আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতির ২৮, ২৯, ৩০ আয়াতে বলিয়াছেন, " রং বেরংয়ের মানুষ, জন্তু বা আনআম রহিয়াছে। আল্লাহর বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানি, তাহারাই তাহাকে ভয় করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" যাহারা আল্লাহর পবিত্র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিজিক দিয়াছি, তাহা হইতে গোপনেও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করিতে পারে, তাহাদের এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই। এই জন্য যে, আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্মের পূর্ন প্রতিফল দিবেন।

বৎস। ইসলাম ব্যবসার জন্য কোন মালপত্র, পন্য ইত্যাদি গুদামজাত করিয়া দীর্ঘদিন মজুদ রাখিয়া অধিক মুনাফা অর্জন করা পছন্দ করেনা বা পছন্দ করেনা সুদ গ্রহন করা ও কৃত্রিম দূর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা। ইসলাম কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার

পরিবর্তে কোমলতা, উদারতা, হৃদয়তা এবং দয়াকে পছন্দ করে। পচ্ছন্দ করে Kindness to all living being. ইসলামের এই উদারতার বিষয় এবং পবিত্র কোরআনের বানী অনুধাবন করিয়া শুরু হইয়াছে ইসলাম ধর্মগ্রহনের পালা। এই সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি খবরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

[সাপ্তাহিক আরাফাত, ২৮শ সংখ্যা, ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী/৯০ বাংলা ৭ই ফাল্গুন ১৩৯৬ সাল, সোমবার।] "বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মাইকেল জ্যাকশনের ইসলাম গ্রহন।"

"বিখ্যাত কন্ঠশিল্পী মাইকেল জ্যাকশন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন বলে জানা গেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মিযান, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৯০ সংখ্যায় এ খবর জানা যায়। সাপ্তাহিক মিযানে আমেরিকার "দ্যম্যান টুডে" সংবাদপত্রের উধৃতি দিয়ে বলা হয়, "হলিউড অঞ্চলে মাইকেলের ইসলাম ধর্মগ্রহণ এখন সকলের আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে। ইতিপুর্বে গত বছরের জুনমাসে মাইকেলের ভাই জারমেন জ্যাকশন ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম ধর্ম কবুল করার পর মাইকেল জ্যাকশন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "আমি একজন খাটি মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে চাই। ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আমি আন্তরিক ও আত্মিক প্রশস্তি পেয়েছি এবং আমার জীবনে প্রকৃত সুখ লাভ করেছি।

"দ্যম্যান টুডে" জানায়, মাইকেল গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই ইসলাম গ্রহন করেন এবং ইসলামী শিক্ষালাভে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর আন্তরিক বাসনা হল, ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হজ্জ সম্পাদন করবেন। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ভ্রমন করবেন। তিনি নিজ ব্যয়ে আমেরিকায় এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করবেন, যাতে ব্যয় হবে প্রায় দু কোটি ডলার।"

বৎস! ইসলামে গনতন্ত্র রহিয়াছে, স্বৈরশাসনের কোন স্থান নাই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিই মুক্তি দিতে পারে বিশ্ব মানব সমাজকে। ইসলামিক অর্থনীতি পাঠ করিলে সহজেই নজরে পড়িবে অর্থনীতির অলংঘনীয় নিয়মগুলি সেখানে বিরাজমান। বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে আর মুক্তির পথ দেখাইতে পারিতেছে না। একমাত্র ইসলাম অনুসৃত মুক্ত অর্থনীতি তথা মিশ্র অর্থনীতিই হইবে আগামী বিশ্বের মানুষের একমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তির পথ। কারণ একমাত্র ইসলামই গ্যারান্টি দিতে পারে বিশ্বের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়ী প্রশান্তির।

মুছাফির! এইবার দয়া করিয়া মানুষের এই মাটির দেহ সম্পর্কে কিছু বল।

বৎস তোমরাতো বর্তমান যুগে সমস্ত বিষয়েই বিজ্ঞানের প্রমান ছাড়া কিছুই বোঝ না। মানুষের শরীরের পরিনতি সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে? তাহাই সর্বাগ্রে শ্রবণকর।

বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর জলে ও স্থলে একটি বিশেষ চক্র বা সার্কেল বিদ্যমান। ঐ চক্রটির মর্মকথা হইল, " মাটির দেহ মাটিতেই মিশিয়া যাইবে।"

যেমন পৃথিবীর মাটিতে গাছপালা,তরুলতা, ফসল ইত্যাদি জন্মে। গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি ঐ সকল তরুলতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। মানুষ ঐ সকল ফসল, তরুলতা প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মানুষ দেহ ত্যাগ করিলে বা অন্যান্য জীবজন্তু মারা গেলে। মাটিতে মিশিয়া যায়, কারণ মাটিতে আছে অগনিত ব্যাক্টেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া পচনে সাহায্য করে, ফলে দেহ মাটিতে মিশিয়া মাটিকে করে উর্বর। আর সেই মাটিতে জন্মে ফসল, গাছপালা ও তরুলতা, তাহা পুনরায় মানুষ ও গরুছাগল প্রভৃতি খায়। মানুষ আবার গরুছাগল, ভেড়ার মাংস খায়। মানুষ দেহ ত্যাগ করিলে এবং জীব জন্তু মারা গেলে মাটিতেই মিশিয়া যাইবে। এইরূপে চলিতে থাকিবে সৃষ্টিকর্তার খেলা।

ঠিক তেমনি ভাবে পানিতে জন্মে ছোটবড় অনেক রকমের জলজ উদ্ভিদ, তাহার মধ্যে জন্মে জলজ পোকামাকড়। ঐ পোকামাকড় ও জলজ উদ্ভিদ মাছেরা খাইয়া জীবন ধারন করে। ছোট ছোট মাছগুলিকে আবার বড় বড় মাছেরা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মানুষও মাছ খায়। মাছও জলজপ্রানী মারা গেলে পানির নীচের মাটিতে মিশিয়া যায়, মাটিকে করে উর্বর, পূনরায় পানিতে সৃষ্টি হয় জলজ উদ্ভিদ তাহা আবার মাছেরা ও অন্যান্য প্রানী ভক্ষন করে এবং মাছও অন্যান্য জলজ প্রাণি মারা গেলে পানির নীচের মাটি পূনরায় উর্বর হইবে। ইহাই বিজ্ঞানের মতামত।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, মাটি, পানি, বাতাস ও খনিজ পদার্থ লইয়াই গঠিত হইয়াছে মানব দেহ। বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী, মৌলিক পদার্থ, মৌলিক পদার্থেই ফিরিয়া যায়। অর্থাৎ " Every thing reverts back to its orign." দার্শনিক ও কবি মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলিয়াছেন,

"তাঁর আলোতে তোর এ দেহ,
হোল আলোকময়,
যে দেহটির দাম নাই কোন,
মাটি ছাড়া কিছু নয়।"

(মসনবী)

বৎস। একজন মানুষের চোখ দুইটি না থাকিলে যেমন পৃথিবীর কোন কিছু দেখা যায় ন। সমস্ত কিছুই অন্ধকার হইয়া যায়। তেমনিভাবে মানুষের আত্মাই শরীরকে প্রানবন্ত করিয়া রাখে। আলোকিত করিয়া রাখে। তাই দেহ হইতে আত্মা বিদায় নেওয়ার পর দেহের আর কোন অনুভূতি থাকে না।

বৎস তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ চক্রের বা নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।

বৎস! মিসরের পিরামিড এর কথা স্মরণ কর! প্রাচীন মিসরের মানুষ দেহত্যাগ করিলে, দেহগুলি এক প্রকার ঔষধের সাহায্যে মমি করিয়া রাখা হইত। তাহাতে দেহ পচিত না। মিসরের সেই পিরামিড বর্তমান যুগেও আশ্চার্য ঘটনা। বর্তমান যুগের মানুষ কিন্তু ঐ ঔষধ তৈয়ারী করিতে পারে নাই। তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, প্রাচীন যুগের মিসরীয়রা ঔষধের সাহায্যে দেহকে পচনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত। এইবার বৎস! চিন্তা কর প্রাচীন যুগের মানুষ যদি ঔষধ আবিষ্কার করিয়া মানব দেহকে পচনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে, যেমন দেহ, মাটির নীচে তেমনই রাখিতে পারেন, ইহাই বা বিশ্বাস না করার কি কারণ থাকিতে পারে?

মূলতঃ আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিকগন এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর মাসিক পত্রিকা "সবুজপাতা" তেইশ বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৭] তে , আব্দুল খায়ের আহম্মাদ আলী, তাঁহার "দুই কবরের বাসিন্দা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,

"হযরত তালহা (রাঃ) দুই কবরের বাসিন্দা। তিনি লড়াইয়ের ময়দানে শাহাদৎ বরণ করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এই জায়গাটি ছিল বেশ নীচু। তাই সেখানে পানি জমে থাকতো। এক ব্যক্তিকে পর পর তিন রাতে স্বপ্নের মাধ্যমে বলা হলো, হযরত তালহার (রাঃ) লাশ সেই কবর থেকে উঠিয়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় দাফন করতে। স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাছ (রাঃ) দশহাজার দিরহাম দিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর বাড়ী খরিদ করে সেখানে হযরত তালহার (রাঃ) লাশ পুনরায় দাফন করেন। আল্লাহর কি অপার কুদরত! ঐ সময় সবাই তাজ্জব হয়ে দেখল, এতো দিন পরও লাশ একটুও পচে নাই, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং হযরত জাবিন (রাঃ) এর বেলায়ওতো এমনি ঘটেছিল। আল্লাহ তাঁহার একান্ত পেয়ারা বান্দাদের লাশ মৃত্যুর পরও এমনই অক্ষত অবস্থায়ই রাখেন।"

বৎস! এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা বিজ্ঞানের শাস্ত্রনুযায়ী সূত্র বা নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই বিজ্ঞানও অস্বীকার করার উপায় নাই, আবার অনুরূপভাবে আল্লাহর কুদরতও মিথ্যা নহে বরং চরম সত্য ইহাই গবেষণায় প্রমানিত হইতেছে।

বৎস। শোন, " আল্লাহ পাকের কুদরত সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাহাদের কৃত কর্মের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

বৎস! আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে অনেক নিদর্শন আছে। ধৈর্য্য ধরে একটু শোন, "ফেরাউনের ভয়ে হযরত মুসা (আঃ) এর জন্মের পর তাঁহাকে সিন্দুকে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফেরাউন উক্ত ভাসমান সিন্দুকটি দেখিতে পাইয়া উহা খুলিতে আদেশ দেয়।

সিন্দুকের ভিতর শিশু মুসা (আঃ) কে দেখিয়া তাহার দয়ার উদ্রেক হয় ও তাঁহাকে পালন করিবার জন্য তুলিয়া নেয়। আল্লাহর কুদরতেই মুসা (আঃ) এর মাতাকে ফেরাউন চিনিতে না পারিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করেন।

পবিত্র কোরআনের সুরা কাসাস ১৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তৎপর আমি তাঁহাকে (হযরত মুসা আঃ) তাঁহার মাতার নিকট পুনরায় আনিয়াছিলাম, যাহাতে তাঁহার চক্ষু শীতল হয় এবং যেন সন্তপ্ত না হয় এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অনেকেই ইহা অবগত নহে।"

এই আয়াতে, আল্লাহ সেই ঘটনা বর্ননা করিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত মুসাকে (আঃ) ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার মাতার মনঃকষ্ট দূর করিয়াছিলাম। ইহা পরম করুনাময় আল্লাহতালার অসীম কুদরতের একটি নিদর্শন।

তিনি ইচ্ছা করিলে এইভাবে সকলকেই সান্তনা দিতে পারেন। বৎস! এই আয়াতের আমল দ্বারা হযরত মুসা (আঃ) কে তাঁহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করা হয় এবং আল্লাহর মহিমা ও শক্তি বর্ননা করা হয়। সেইজন্য " এই সুরার আমলের দ্বারা পলাতক ব্যাক্তিকে ফিরিয়া পাওয়া যায়।" **(নেয়ামুল কোরআন)**

প্রিয় রাসুল (সঃ) বলিয়াছেন, "হযরত মুসা স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আমার প্রভু! বেহেশতীগনের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেনীর ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলেন,! সমুদয় বেহেশতীগন, বেহেস্তে প্রবেশ করার পর সর্বশেষে যে ব্যক্তি আগমন করিবে, তাহকে বলা হইবে, তুমি বেহেস্তে প্রবেশ কর। সে বলিবে এখন আমি কোথায় যাইব? সকলেইতো স্ব, স্ব স্থানে উপনীত এবং আল্লাহর নিয়ামত সমূহ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাকে বলা হইবে, পৃথিবীর যে কোন সম্রাট যে

সকল সুখ সম্পদের অধিকারী ছিল, তুমি সেইরূপ সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিলে কি সন্তুষ্ট হইবে? লোকটি বলিবে, নিশ্চয়ই হে আমার প্রভু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট। তখন তাহাকে আল্লাহ বলিবেন, তোমার জন্য এইরূপ, ইহার দ্বিগুন এবং ইহার তিনগুণ এবং চারগুন প্রদত্ত হইল। লোকটি বলিবে, হে প্রভু, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, এইগুলি সমস্তই তোমার এবং এই সমস্তের অনুরূপ আরও দশগুণ। লোকটি নিবেদন করিবে, হে প্রভু! আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহ বলিবেন, এই সমস্তের তুমিতো অধিকারী হইলেই, অধিকন্ত তোমার মন যাহা আকাংখা করিবে এবং তোমার নয়ন যাহাতে সুশীতল হইবে, সমস্তই তোমাকে প্রদান করা হইল। **(তিরমিযী)**

বৎস। বিদায় হজ্জের দিনে আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাঁহার উম্মতকে যে বিদায় ভাষন শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, " নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমদের সম্ভ্রম ও তোমাদের দেহ তোমাদের জন্য পবিত্র।" এবং জাহেলী যুগের সমুদয় দাবী বাতিল। **(বুখারী শরীফ)**

তিনি আরও বলিয়াছেন, " আল্লাহর সঙ্গে শিরক করিও না, আইন সঙ্গত কারন ছাড়া কাহাকেও বধ করিও না, ব্যাভিচার করিও না, চুরি করিও না। **(মুসলিম শরীফ)**

বৎস! মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখিও, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম, অবস্থা ও অন্তরের গোপন বিষয় জ্ঞাত রহিয়াছেন। কাহারও মনোবাসনা ও পরিকল্পনা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তিনি তাহার ইচ্ছা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র কোনআনের সুরা ফা-তির ৩৮ আয়াতে বলিয়াছেন, "আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্যবিষয় ও বস্তুসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন। মানুষের অন্তরে যাহা আছে, সে বিষয়ে তিনি সবিশেষঅবহিত।"

বৎস! সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে সংরক্ষিত। চন্দ্র, সূর্য্য, আসমান জমিন সমস্ত কিছুই আল্লাহর আদেশ পালন করিয়া থাকে। আল্লাহই তাহাদের নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকেন। কাহাকেও তাহার নিজ কেন্দ্র বিন্দু হইতে স্থান চ্যুত হইতে দেননা বা সরিয়া যাইতে দেননা। সেই কারনেই বৈজ্ঞানিকগন বলিয়া থাকেন, There is a great power.

বৎস! পৃথিবীর সমস্ত মান-সম্মান, সমস্ত ধন-রত্ন, সমস্ত শক্তি, মহাশক্তির মালিক পরম করুণাময় আল্লাহ। কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত পৃথিবী, আকাশ,

মহাকাশের সমস্ত কিছু, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি চূর্ন-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন কেহ আর তাহা রক্ষা করিতে পারিবেনা। এই কারনেই বলা হয়, "আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।"

এই সম্পর্কে সুরা ফা-তির ৪১ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থান চ্যুত না হইতে পারে, উহারা স্থানচ্যুত হইলে আল্লাহ ব্যাতীত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিতে পারিবে?" আল্লাহ বলেন, আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন হইবে না, হইবে না কোন ব্যতিক্রম।

বৎস! দুনিয়াতে মানুষ যে ভাবে পাপ কাজে করে, কুফরী করে, শিরক ও বেদাতী করে, এই সকল ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিয়ম, পদ্ধতি এবং তাঁহার ব্যবস্থাপনার কোন পরিবর্তন হইবেনা। কারণ আল্লাহ অতি ধৈর্য্যশীল। তাহার ধৈর্য্যের জন্যই সমস্ত কিছু ঠিক আছে। আর আল্লাহ যদি ক্ষমা না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী জনমানব শূন্য হইয়া পড়িত।

বৎস। পরম করুনাময় আল্লাহ সুরা 'বকর' এর ১০৭, ১১৫, ১১৬, ১১৭, আয়াতে বলিয়াছেন, " তুমি কি জাননা যে, আল্লাহর নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের উপর আধিপত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই তোমাদের অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই। আল্লাহর জন্যই পূর্ব পশ্চিম সমস্ত দিক, অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহর লক্ষ্য, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত সুপ্রশস্ত ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ পরম পবিত্র; বরং আকাশ ও ভূ-মন্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই জন্য, সমস্ত কিছুই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন উহার জন্য কেবলমাত্র 'হও' বলেন আর তাহাতেই সমস্ত কিছু হইয়া যায়।"

আচ্ছা মুছাফির! আল্লাহকে কি দেখা যায়? কেহ কি কোন দিন আল্লাহকে দেখিয়াছেন।? যদি কেহ আল্লাহকে দেখিয়া থাকেন, তবে আল্লাহ তাহাকে কি ভাবে দেখা দিয়াছেন?

বৎস! তোমাকে এত কিছু শুনাইলাম, তবু তোমার জানার ইচ্ছা মিটিল না? তোমার তৃষ্ণার্ত অন্তরের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইল না। তবে শোন;

হযরত মুসা (আঃ) একদা ইসরাইলদিগকে অবিশ্বাস ও ধর্মদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে অনুরোধ করায়, তাহারা বলিয়াছিল, " যে পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখিব, সে পর্যন্ত তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবনা। হযরত মুসা(আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর দর্শনের জন্য পবিত্রভাবে প্রস্তুত

হইতে বলেন। তাহারা তদানুযায়ী প্রস্তুত হইলে, আল্লাহতালার মহাশক্তির সামান্য ক্ষীণ জ্যোতিরেখা তুর পর্ব্বত হইতে বজ্রধবনীসহ বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহাদের উপর সঞ্চারিত হয়। এবং সেই অলৌকিক ক্ষীণ জ্যোতির স্পর্শে তাহারা সকলেই জীবন শূন্য অবস্থায় মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আল্লাহর করুনা প্রভাবে তাহাদের জীবন শক্তি ফিরিয়া আসে ও তাহারা চেতনা প্রাপ্ত হয়।

এতদ্বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সুরা 'বকর' ৫৫ ও ৫৬ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, "যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করিবনা। তখন বিদ্যুৎ তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন শূন্য অবস্থায় মূর্ছিত হইয়াছিলে। তৎপর আমি তোমাদের সঞ্জীবিত করিয়াছিরাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

বৎস! এই কারনে পাশ্চাত্য দেশের বহুপন্ডিত বিদ্যুতের পুঁজা করিত। তাহাদিগকে বলা হইত বিদ্যুৎ উপাসক। ইতিহাসে হয়তো পাঠ করিয়া থাকিবে বৈদিক যুগের লোকেরা আলোর দেবতা সূর্য্যকে উপাসনা করিত। কিন্তু ঐ আলো আর ঐ বিদ্যুৎ যে মহাশক্তিশালী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহাশক্তির সমান্যতম অংশ মাত্র তাহা তখনও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিল না।

বৎস! পবিত্র কোরআন পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে, "আল্লাহ মহা জ্যের্তিময়" আল্লাহ মহাবৈজ্ঞানিক।"

বৎস! সমস্ত বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের উৎস পরম করুণাময় আল্লাহ। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদের জ্ঞানভান্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া তাহা পরিপূর্ন করিয়া দিতেপারেন।

তেমনি ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করিয়া তোমাদের ধনভান্ডারকে পূর্ন করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ, আল্লাহর প্রতি রাখ ভরসা। আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ্দ করিয়া তাঁহার করুনা লাভের জন্য যিকির কর, নামাজ পড়, আল্লাহর হুকুম পালন কর।

বৎস! পূর্বেই বলিয়াছি আল্লাহ কথা বলিতে পারেন, সম্মুখ ও পশ্চাতের সমস্ত কিছু দেখিতে পারেন, মানুষের অন্তরের গভীরতম স্থানের কথাও জানিতে পারেন।

এতদ্বিষয়ে সুরা ' বকর' এর ২৫৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "রসুলদের কাহারও কাহারও সহিত আমি কথা বলিয়াছি, কাহাকেও উচ্চ পদমর্য্যদায় সমুন্নত করিয়াছি। আমি মরিয়ম নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নির্দেশাবলী দান করিয়াছি, তাহাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করিয়াছি।" বৎস! এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে

পারিয়াছ, সেই আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই, যিনি চির জীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষন করেনা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর দিদার লাভ করিয়াছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাপ্তাহিক বাংলা ম্যাগাজিন "অগ্রপথিক" ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ২রা মার্চ ১৯৮৯তে সম্পাদক এর কথায়, সম্পাদক হাসান আব্দুল কাইয়ুম লিখিয়াছেন, "মিরাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি, আরোহন, উর্ধগমন।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জমস্থ কা'বা শরীফের চত্বর হইতে জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আক্‌সায় উপনীত হওয়া এবং সেখান হইতে সপ্তাকাশ ভ্রমন করিয়া আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হওয়ার ঘটনাই মিরাজ। কাবা শরীফ হইতে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত এই ভ্রমনকে 'ইসরা' এবং মসজিদুল আক্‌সা হইতে উর্ধলোকে ভ্রমনের অংশটুকু মিরাজ নামে অভিহিত।"

বৎস! মিরাজ সম্পর্কে পরম করুনাময় আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইস্রাইলের ১ আয়াতে বলিয়াছেন, "আল্লাহর মহিমায় যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমন করাইয়াছিলেন, মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আক্‌ছা পর্যন্ত এবং দেখাইয়াছিলেন তাঁহার নিদর্শন, যাহা তিনি শোনেন ও দেখেন।" এই আয়াতের প্রথম অংশটুকু "ইখরা" এবং শেষ অংশটুকুই মিরাজ।"

এই আয়াতে বিশ্বনবীর মিরাজের ঘটনার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বায়তুল্লার হাতিম নামক স্থানে ঘুমাইতেছিলেন। মানব আকৃতিতে একজন ফেরেস্তা তথায় আগমন করিয়া হুজুর পাকের বক্ষ জমজমকূপের পানি দ্বারা ধৌত করেন। অতঃপর হাজির করা হয়, বোরাক বা বিদ্যুৎ গতিবাহন। হুজুর (সঃ) তাহাতে আরোহন করেন, সঙ্গে ছিলেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)। **(খাজেন)**

[বোরাক শব্দটি আরবী শব্দ বারকুন হইতে আসিয়াছে। বারকুন শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ]

"বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাতের ১নং হাদীসে মিরাজ শরীফের বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রিয় নবী(সাঃ) মিরাজে গমন করেন বুরাক নামক বাহনে। এবং তিনি প্রথমে আসেন জেরুজালেমে। তারপর সেখানে বায়তুল মুকাদ্দসে আম্বিয়া কেরামের এক জামাতে তিনি ইমমতি করেন।

তারপর সেখান হইতে প্রিয়নবী (সাঃ) মহাশূন্যের দিকে উঠিতে থাকেন।

তিনি প্রথম আসমানে সাক্ষাৎ করেন, মানব জাতির পিতা আদম (আঃ) এর সঙ্গে। দ্বিতীয় আসমানে সাক্ষাৎ করেন, হযরত ইউছুফ (আঃ) এর সঙ্গে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস(আঃ) এর সঙ্গে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ) এর সঙ্গে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা(আঃ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সপ্তম আসমানে তিনি ফেরেস্তাদের কেবলা বায়তুল মামুর দর্শন করেন। ইহার পর তিনি সিদরাতুল মুনতাহা মকামে তিনি উপনীতহন।

এই ভ্রমনে তাঁহার সম্মুখে যাবতীয় গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত হইয়া যায়।

অতঃপর সেখান হইতে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) "রফরফ" নামক বাহনে ৭০ হাজার অন্ধ কারের পর্দা ও ৭০ হাজার আলোর পর্দা পার হইয়া আল্লাহর আরশ আজীমে উপনীত হন। এই খানেই পরম করুনাময় আল্লাহর সঙ্গে তাঁহার দিদার হয়।

বৎস! পবিত্র কোরআনের সুরা নাজমে উল্লেখ আছে, "তখন তিনি উর্ধ দিগন্তে, অতঃপর তিনি তাঁহার (আল্লাহর) নিকটবর্তী হইলেন।"

এত নিকটবর্তী যে তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক পরিমান কিম্বা তারও কম ব্যাবধান ছিল। (দুই ধনু অর্থাৎ প্রায় তিন হাত)

তখন আল্লাহ তাহার বান্দার প্রতি যাহা যাহা ওহী করিবার, তাহা তাহা ওহী করিলেন। যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, "তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করিবে?" উক্ত অগ্রপথিক পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন, "প্রিয়নবী (সাঃ) মিরাজে গিয়াছিলেন স্বশরীরে।"

উক্ত অগ্রপথিক পত্রিকায় "মিরাজও সালাত" নামক নিবন্ধে অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লা বলিয়াছেন, "মিরাজের এ বিস্ময়কর সফরে হুজুর (সাঃ) আরশে আজীমে আল্লাহর দীদার, আল্লাহর কুদরত, গোপন রহস্যরাজি, জান্নাত, জাহান্নাম ও বহু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন।"

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে পরম করুনাময় আল্লাহতালা বিদায় দেওয়ার প্রাককালে ৫০ ওয়াক্ত নামায উপহার দিয়াছিলেন।

আমাদের প্রিয়নবী, আখেরী নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বন্ধু।

আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বন্ধুকে বারংবার দর্শনের জন্য এবং মহব্বৎ লাভের ও একাধিকবার বাক্য আদান প্রদানের সুযোগ লাভের নিমিত্তে সুমহান উদ্দেশ্য লইয়াই একাধিকবার পূর্ণ দিদার ও বাক্য বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রিয়নবীর নিবেদনে আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের জন্য ৫০ ওয়াক্তের পরিবর্তে মাত্র ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।

আল্লাহর দিদার ও মহব্বত লাভ করিয়া পরম আনন্দে ফিরিবার পথে প্রিয়নবী স্বীয় উম্মৎগনের উপকারের জন্য এবং উম্মৎগনের আত্মার উন্নতির জন্য উম্মতের আত্মাকে উজ্জল ও রুহানী শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরকালে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট হইতে কতিপয় আদেশ লইয়া আসিয়াছিলেন।

বৎস! এইবার নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছ হযরত মুসা (আঃ) ও অবিশ্বাসী ইসরাইলগন কিভাবে, কি অবস্থায় আল্লাহর দর্শন পাইয়াছিল এবং ইসরাইলগনের অবিশ্বাসের পরিণতি হিসাবে কি অবস্থা হইয়াছিল! আর আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কিভাবে আল্লাহর দিদার লাভ করেন। আল্লাহর সমস্ত গুপ্ততত্ব, কুদরত, জান্নাত ও জাহান্নাম প্রিয়নবী (সাঃ) দর্শন করিয়াছিলেন।

বৎস! বর্তমান যুগ মানুষের চাঁদে যাওয়ার যুগ, মঙ্গল, শনি, নেপচুন ও অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার যুগ।

বৎস! এখন মানুষ চাঁদে যায়, মঙ্গল গ্রহে যায় এবং বিভিন্ন গ্রহের অবস্থা সম্পর্কে সহজেই অবগত হয়।

আল্লাহপাক, তাহার রাসুল (সাঃ) কে মিরাজে গমনের জন্য বোরাক পাঠাইয়াছিলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সঙ্গে তিনি উহাতে আরোহন করিয়া গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে গমন করিয়া নিদিষ্টস্থানে পৌছিয়াছিলেন এবং সপ্তাকাশ ভ্রমন করিয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

বৎস! ভাবিতে তোমার খুব অবাক লাগিতেছে তাইনা? এইবার চিন্তাকর, গভীর হইতে আরও গভীরে চিন্তা কর। মানুষ আবিষ্কৃত রকেট যদি মূহুর্তে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিতে পারে, তবে মহান আল্লাহ পাকের "বোরাক" কেন নিমিষে দূর দূরান্ত অতিক্রম করিতে পারিবেনা?

নবী করিম (সাঃ) ৭০টি অন্ধকারের পর্দা এবং ৭০টি আলোর পর্দা অতিক্রম করিয়া সেই মহা জ্যোতির্ময়, মহাশক্তি, মহাপরাক্রমশালী, পরম করুনাময় আল্লাহর নিকটে পৌছিয়াছিলেন, ইহা সম্পর্কে আশাকরি এখন আর কোন সন্দেহ নাই।

বৎস! তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রি আহম্মাদ হামদী আকেসকী, হয্রত মোহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন,

"বিশ্ব সম্রাটের এক মহান জন্ম, স্বর্গ ও মর্তকে করেছিল উদ্ভাসিত, সেই মূহূর্তটি ছিল, বারই রবিউল আউয়ালের শান্ত স্নিগ্ধ সোমবারের পবিত্র রাত।"

(অনুবাদক উপাধ্যক্ষ মহীউদ্দীন আহম্মাদ)

"কবি জাসিকার, রাসুল (সাঃ) এর বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "রাসুল (সাঃ) এর সৌন্দর্য্যর সাথে হয্রত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য্যের কোন তুলনা হয়না।

ইঁনি ছিলেন একটি উজ্জল নক্ষত্র, একটি দীপ্তিমান সূর্য্য এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গি ছিল সমস্ত আরব বাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

সমস্ত আরবের ভাগ্যাকাশ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, সমগ্র আরব ভূমি যখন কুসংস্কারাচ্ছান্ন, সত্য যখন পৃথিবীর বুকে বিলুপ্ত, উপেক্ষিত, জুলুম যখন ভরপুর, আরবের সেই মহা দূর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পরম করুনাময় আল্লাহতালা আরবের ভাগ্যাকাশে ৫৭০ খৃঃ এর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে উদিত হয় এক উজ্জল নক্ষত্র যাহার আলোকে পৃথিবী হয় আলোকিত, অন্ধকার হয় দূরিভূত এবং অত্যাচার জুলুম ও অসত্যের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় দয়া, উদারতা এবং মহা সত্য আর জনজীবনের অশান্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাশান্তি, তিনিই আমাদের দয়ার নবী হয্রত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)।

কবি জয়নুল আবেদীন মাহবুব বলেন,

মক্কা মরুর বালুকার গুলবাগে,
ফুটলোরে এক ফুল
সেই ফুলেরই খুশবুতে তাই
গান গাহে বুলবুল।
রহমানুর রাহিম দিলেন উপাধি
"রহমাতুল্লিল আলামিন"
শেষ বিচারের দিন হবেন তিনি
'শাফিউল্মুজনেবীন।'

[দৈনিক আজাদের মুকুলের মহফিলের সৌজন্যে]

বৎস! একটু অনুভব কর এবং স্মরণ কর হয্রত নবী করিম (সাঃ) বিদায় হজ্বে যে ভাষন দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কিভাবেই বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে তিনি আর এই পৃথিবীতে থাকিবেন না।

আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাওয়ার জন্য দাওয়াত আসিয়াছিল জন্যই তিনি হজ্জের ভাষনে বিদায় চাহিয়াছিলেন। হজ্জ হইতে বিদায় লইয়া নবী (সাঃ) মদীনায় পৌছিয়া তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে যতশিঘ্র সম্ভব উপস্থিত হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন এবং অপেক্ষা করিতে থাকেন সেই শুভ লগ্নটিরজন্য।

এই সময়ে ওহুদের যুদ্ধের শহীদ যোদ্ধা ও বিশ্বস্ত সাহাবাদের মাজারে গমন পূর্বক তিনি তথায় আবেগভরা কণ্ঠে, ভাবাবেগে গদগদ হৃদয়ে শহীদদের জন্য আল্লাহর সদনে মোনাজাত করেন।

অতঃপর তিনি ঘনিষ্ঠ সহচর ও বন্ধদের নিকট হইতে বিদায় নেওয়ার জন্য মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইয়া তথায় সবাইকে উদেদ্দশ্য করিয়া বলেন, "বন্ধুগন! তোমাদের পূর্বেই আমি পরম করূনাময় আল্লাহর নিকট যাইতেছি।"

অতঃপর তিনি অমাযামিনীর গভীর নিশিতে জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার কবরে শায়িত ব্যক্তিগনের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে নীরবে ঘুমন্ত বন্ধুগন! আমিও অতিশিঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইব।"

সেই নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে পরম করূনাময় আল্লাহর দরবারে তিনি তাঁহাদের জন্য দোয়াকরেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই নবী (সাঃ) মদীনার সমস্ত মুসলমানদের একদিন মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রন জানান এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বন্ধুগন! সর্বক্ষন আল্লাহকে স্মরন করিও, জানিয়া রাখ আল্লাহই তোমাদের একমাত্র রক্ষক ও প্রতিপালক। তোমরা আল্লাহকে ভয় করিও, ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ আহব্বান।"

ইহার মাত্র কয়েকদিন পরেই আল্লাহর নির্দেশিত পথ, ইসলামের সুমহান বিধানের প্রচার কার্য সমাপ্ত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শনের পর হিজরী একাদশ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের সূর্য্যোদয়ের পর এই মহা সূর্য্য আমাদের নবী করিম (সাঃ) অস্তগমন করেন।

তাঁহার বহুঘনিষ্ঠ সাহাবাদের উপস্থিতে প্রিয়তমা পত্নি আয়েশা (রাঃ) এর শয়ন গৃহে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

সিরিয়া নিবাসী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পত্নি ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বিবি হাজেরাকে শিশু পুত্র ইসমাইল সহ আরবের মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করেন। এবং অন্যতম পত্নি সারা খাতুনকে লইয়া সিরিয়ায় বাস করিতে থাকেন।

এই সারা খাতুনের পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ)। হযরত ইসহাক (আঃ) এর পুত্র হযরত ইয়াকুব(আঃ)। তিনি হযরত ইসরাইল (আঃ) নামেও পরিচিত।

এই ইসরাইল (আঃ) এর বংশে হযরত ইউছুফ (আঃ) বা (জ্যোসেফ), হযরত ইসা(আঃ) বা যীশু এর মাতা মরিয়ম বা মেরী, হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত মুসা(আঃ) প্রভৃতি মহাত্মাগনের জন্ম হয়। অপর দিকে হযরত ইব্রহীম (আঃ) এর নির্বাসিতা স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইলের বংশে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম হয়।

এই ইসমাইল (আঃ)ই ছিলেন মক্কা নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার ১১শ পুরুষ পরবর্তী পুরুষ জনৈক 'কোরেশের' নামানুসারে এই বংশের নাম 'কোরেশ বংশ' নামে অভিহিত হয়।

উক্ত 'কোরেশের' অধস্তন ৮ম পুরুষ হাসেমের পুত্র আঃ মোতালেব, তাঁহার পুত্রআব্দুল্লাহ।

এই আব্দুল্লাহই হইলেন আমাদের মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জনক এবং মাতার নাম আমিন। আমিনার গর্ভাবস্থায় আব্দুল্লাহ মদীনায় গমন করিয়া তথায় দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার ইন্তিকালের পর ৫৭০ খৃঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জন্ম গ্রহন করেন। ৬ বৎসর বয়সের সময় নবী জননী হযরত আমিনা (রাঃ) দেহত্যাগ করেন এবং অষ্টম বৎসরে তাঁহার পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব লোকান্তরে গমন করেন।

ক্রমতাবস্থায় পিতৃব্য আবুতালেবের স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে লালন পালন করেন। এই সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার কারনে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিদ্যাশিক্ষার কোন সুযোগ পাইয়াছিলেন না। এয়োদশ বর্ষ বয়স হইতেই তিনি চাচা আবুতালেবের সহিত উষ্ট্রদল সমভিব্যবহারে বানিজ্যার্থে শ্যামদেশ বা সিরিয়া গমনকরেন।

এই রূপে পচিঁশ বৎসর পর্যন্ত তিনি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। অতঃপর খাদিজা নামে এক ধনবতি বিধবাকে বিবাহ করেন।

তিনি আরব বাসীদের দুরাবস্থা লক্ষ্য করিয়া গার--এ–হিরা নামক একটি পর্বত গুহায় নিবিষ্ট মনে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন।

৪০ বৎসর বয়সের সময় তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহতালার আদেশ ক্রমে নবুয়াত প্রাপ্ত হন।

হযরত জিব্রাইল আল্লাহর নিকট হইতে যে সকল বানী আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে শুনাইতেন তাহাই পবিত্র "কোরআন" নামে অভিহিত।

তিনিই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। সর্ব প্রথম তাঁহার পত্নী, তৎপর হযরত আলি(রাঃ), হযরত আবু বকর(রাঃ), হযরত ওসমান গনি(রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুসারিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁহার বিরোধী হইয়া নানা প্রকার অসুবিধার ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদীনায় গমন করেন। ইহাকেই নবীর হিজরত বলা হয়। মদীনাবাসী হযরত(সাঃ) কে সানন্দে গ্রহন করেন। এবং ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের সময় হইতেই মুসলমানেরা হিজরী সনের গননা আরম্ভ করিয়াছেন।

[৬২২ খৃঃ ২রা জুলাই হযরত মদীনায় পৌছেন।]

অনূর্বর ও মরুভূমিময় মক্কার আবহাওয়া ইহার অধিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রচন্ড গরম ও উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে মক্কার লোকেরা ছিল খুবই উগ্রমেজাজী। সেই কারণে তাহারা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিত না।

অপর দিকে মদীনা ছিল উর্ব্বর এবং মক্কার আবহাওয়ার ন্যায় মদীনার আবহাওয়া ততটা চরমভাবাপন্ন নয়। মদীনার অধিবাসীরা অত্যান্ত দয়ালু, বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ও চিন্তাশীল এবং মক্কার অধিবাসীদের চাইতে অধিক জ্ঞানী হওয়ার কারণে ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে হওয়ায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন।

মদীনাবাসী একজন পয়গম্বরের আগমন সম্পর্কে পূর্বেই তাহাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে পাইবার জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। এই হিজরত ছিল হযরতের জীবনের তথা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। হিজরত হইতেই হযরতের মক্কা জীবনের অবসান এবং মদীনা জীবনের সূচনা হয়। "অবমাননা, অত্যাচার এবং নিরাশার দিনগুলি শেষ হইয়া বিজয় যুগ আরম্ভ হয়।" (পি,কে,হিটিট্টি)

হযরতের মদীনা আগমনের পর হইতে ইসলাম ধর্ম দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। অধিকাংশ মদীনাবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ইহার ভিত্তি ও শক্তিকে সুদৃঢ় করিয়াছিল। মদীনা আসিয়া হযরত শুধু সম্মানিতই হলেন না, হযরতের ত্যাগ–তিতিক্ষা ও সাধনা সার্থক রূপ ধারণ করে। আর কাল ক্রমে

হযরত সেখানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়া উক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হইয়াছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থে নব দীক্ষিত মুসলমানগন ছিলেন এক একটি লৌহ মানব। দারিদ্রতা, ক্ষুধা কিম্বা যুদ্ধবিগ্রহ কোন কিছুতেই তাহারা কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হননাই।

বৎস। হযরতের মদীনায় অবস্থান কালে একদিন হযরত ওমর (রাঃ) হযরতকে বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, কে যেন আমাকে আযানের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন।"

তখন হযরত যুক্তি তর্কের সাহায্যে আযানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা গ্রহন করিলেন এবং সেই ইসলামী দুনিয়ায় আযান প্রবর্তিত হইল। ইহার পূর্বে প্রকাশ্যে নামাজের আহ্বান করা বিপজ্জনক ছিল।

হযরত বেলাল সর্ব প্রথমে মুসলমানদিগকে নামায পড়িবার জন্য আযান দিয়া আহ্বান করেন। এবং প্রত্যেক শুক্রবার দুপুর বেলা মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হইয়া নামাজ পড়িবার প্রথা প্রবর্তিত হয়।

জেরুজালেম প্রথমে মুসলমানদের কেবলা ছিল কিন্তু হযরত দেখিলেন, ইসলাম ধর্ম ইহুদী ধর্মের সহিত হাত মিলাইয়া চলিতে পারিবেনা, তখন আল্লাহর আদেশে জেরুজালেম হইতে কেবলা পরিবর্তিত হইয়া কাবা ঘর ইসলামের কেবলা হয়। খাতনা প্রথা হযরত ইব্রহিম (আঃ) এর আমলে প্রচলিত রীতি হিসাবে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হযরত পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য ঐ প্রথা গ্রহন করেন।

অতঃপর পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুসারে বিবাহ, পুর্ণবিবাহ, তালাক এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তিত হয়।

বৎস। পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ২২ এবং ২৩ আয়াতে বিবাহ সম্পর্কে বিধি নিষেধ আরোপিত হইয়াছে।

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিওনা।" (২২ আয়াত)

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগনেরী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগিনী, শাশুরী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সঙ্গম হইয়াছে তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাহাদের সহিত সঙ্গম না হইয়া থাকে, তবে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমাদের জন্য

নিষেদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা যাহা পূর্বে হইয়াছে।" (২৩ আয়াত)

"– – – ইহারা ব্যাতীত আর সব নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হইল এই শর্তে যে, তোমরা আপন সম্পদ দিয়া মোহরানা ও কাবিন যোগে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিবে, ব্যাভিচার করিবার জন্য নহে– – – ।
(২৪ আয়াত)

২৫ নং আয়াতে সৎস্বভাবের দাসিগনকেও বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ ক্ষেত্রেও মোহর প্রদান অত্যাবশ্যক করা হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে মোহর প্রদানের নির্দেশ দিয়া স্ত্রী জাতিকে সম্মানিত করা হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। – – – তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে।" (সূরা নিসা ১২৯ আয়াত)

[হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলীমতে মোহরের পরিমান ১০ দিরহামের কম হইবে না। ইচ্ছা করিলে মোহরের পরিমান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।]

ইসলামী শরীয়তের বিধান হইতেছে, সুষ্ঠ সমাজ গঠন করা। শরীয়তের শাস্তির বিধান কঠোর হইলেও ইহার ফলে সমাজে অপরাধ প্রবনতা কমিয়া সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৎস। ইসলামের চারটি বিবাহ করার বিধান রহিয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ এবং বিধবাদের পুর্ণবিবাহ মানুষকে নৈতিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করে।

স্বামী ও স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে অন্যায় ও বে–আইনীভাবে অপবাদ দিলে, স্বামী ও স্ত্রীর মতের মিল না হইলে, স্বামী নিষ্ঠুর হইলে বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ্য হইলে বা দাম্পত্য জীবন যাপনে অক্ষম হইলে, তিন বৎসরের অধিক কাল নিরুদ্দেশ থাকিলে বা ভরন পোষন না দিলে বা খোঁজ খবর না দিলে বা স্বামী স্ত্রীর নিকট গুরুতর ক্ষতির কারণ হইলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারিবে। অপর দিকে স্ত্রী যদি ব্যাভচারিনী হয়, শরীয়ত মোতাবেক চলাফেরা না করে, কিম্বা অন্য কোন কারণে স্বামীর নিকট গুরুতর ক্ষতির কারণ হয় বা স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপনে অপারগ হয় বা অস্বীকৃতি জানায় তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিবে। তবে পবিত্র কোরআনের সুরা বকর ২৩২ আয়াতে বলা হইয়াছে, "উভয়ের ইচ্ছা থাকিলে তালাকের পরও পূনরায় সম্পর্ক স্থাপন করা যাইবে।

সুরা বকর ২৩৭ আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই তালাক প্রদান কর, এবং তাহাদের প্রাপ্য নির্ধারিত করিয়া থাক তবেযাহা নির্ধারিত করিয়াছিলে তাহার অর্ধেক পরিশোধ করিবে। ইসলামে বিধবা

বিবাহের বিধানটি বড়ই চমৎকার। ইসলামের এই বিধান বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও গ্রহন করিতেছে।

পূর্বে হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারা হইত। যাহা অত্যান্ত নিষ্ঠুর এবং হৃদয়বিদারক।

ইসলামে একটি পুরুষের চারটি বিবাহ করার অনুমতি থাকায় বিধবা বিবাহ সহজ হইয়াছে। আবার প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা কিম্বা রোগগ্রস্থ হইলে তালাক না দিয়াই বা বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহন করার বিধান থাকায় বা এক সাথে চারটি স্ত্রী বিবাহ করার বিধান থাকায় মুসলমান পুরুষগন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না।

পবিত্র কোরআনে বিধবাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয় এবং নিজের স্ত্রীকে রাখিয়া যায়, তবে তাহারা চারমাস দশদিন অপেক্ষা করিবে। **(সূরা বকর ২৩৪ আয়াত)**

[মুসলিম আইনে তালাকের কারণে ৯০ দিন ইদ্দত পালনের বিধান তবে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।]

এই রূপে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিধবাগন অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের কোন বিধান নাই।

ফলে সেই সকল ধর্মের ও দেশের লোকেরা যৌন বিভ্রাটে ভুগিতেছে এবং সমাজ জীবনে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশ সমূহে দাম্পত্য জীবনে কোন আদর্শ নাই বা ইসলামের মত কঠোর পর্দা প্রথাও নাই। যাহার ফলে ঐসকল দেশের লোকেরা গোপন ভাবে যৌন অপরাধ ও ব্যাভিচার করিতে কোন প্রকার দ্বিধা করে না। বা ইসলামের মত আত্মসংযোমের বিধান ব্যাপক ভাবে মানিয়া না চলার কারনে ঐ সকল দেশে ব্যাভিচার বা যৌন অপরাধ ব্যাপক আকার ধারন করে। কারণ "ক্ষুধিত আত্মার ভালমন্দের কোন বিচার বোধ থাকেনা।"

আর সেই কারনেই হয়তো অপরাধের দুয়ার খুলিয়া যায়, ধ্বংস হয় নৈতিকতা, কলংকিত, জঘন্য ও ঘৃনিত হয় মানব আত্মা এবং আল্লাহর দয়া ও কৃপার

পরিবর্তে বর্ষিত হয় আল্লাহর লানত। সেই সঙ্গে সমাজে সৃষ্টি হয় 'এইডস' এর মত দূরারোগ্য রোগব্যাধি।

মানুষ আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়া রোগ ব্যাধির জন্য নিত্য নতুন ঔষধ তৈয়ার করিতেছে, রোগব্যাধি প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে, সতর্ক হইতেছে। আল্লাহ ও নতুন রোগ ব্যাধি, সৃষ্টি করিতেছেন। এবং ভয়াবহ বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, নিত্য নতুন দুর্ঘটনা প্রভৃতির অবতারনা করিতেছেন। বৎস! ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ হইল পাঁচটি। যথাঃ কালেমা, নামায, রোজা, হজ্জ্ব ও যাকাত। এইখানে প্রতিয়মান হয় যে, কালেমা পাঠের মধ্যদিয়াই ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা হয়।

এই কালেমা–ই, ইহজগতে মুক্তির দ্বার এর চাবি এবং পরজগতের বেহেস্তের দরজার চাবি। কালেমাটি হইল, ''লা–ই–লাহা, ইল্লাল্ লাহ, মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ''।

ইহার অর্থ আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কোন প্রভু নাই; হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) তাঁহার রাসুল। ইহাই হইল ইসলামের আর্দশের ভিত্তি।

পবিত্র কোরআনে সুরা আল ম'মিনিন, ২৩, ৫২, ৫৩ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''পূর্বে মানুষ একই জাতির ছিল। পরবর্ত্তী কালে মানুষ তাহাতে বিচ্ছিন্নতাসৃষ্টি করিয়াছে।''-----।

সুরা ইউনূছ ১৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''লোক ছিল দ্বীনের একই ত্বরিকায়, মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে পরে।''

অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতি, বাবা আদম (আঃ) হইতেই আগত।

এই সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের মহাভারতে বলা হইয়াছে, ''ন–বিশেষোহস্তি বর্ণানং স্বয়ং ব্রহ্মামিদঃ জগতঃ ইহার অর্থ হইতেছে সমগ্র মানব জাতি ব্রহ্মা হইতে আসিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মন। (মহাভারত শান্তি পর্ব)

কিন্তু হিন্দু পন্ডিতগণ ব্রাহ্মনকে পৃথক করিয়া রাখিয়া বহু গোত্রের ও জাতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং শুধু তাহাই নহে, এক একটি ছোট জাতকে আবার শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ধর্ম চিন্তাবিদ Jogn Lews B. Sc. ph. D. তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Religious of World Simpe" গ্রন্থের ২৮ পৃষ্টায় বলিয়াছেন, "Fut side the cast systemar some 55000, 000 old castas engeged inseauening and sivilar occupations

who are regarded as clremoutally under that is untouchable." অর্থাৎ বিশ্বে জাতি প্রথা বহির্ভূত ৫৫০০০,০০০টি ছোট জাত রহিয়াছে তাহারা মেথর, ঝাড়ুদার ডোম---- ইত্যাদির মত নিম্ন পর্য্যায়ের কাজ করিয়া তাহারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হিসাবে ধরাহয়। ('মানবতার মুক্তির পথ' অধ্যাপক আব্দুর রায্যাক)

বৎস! ইসলামে কিন্তু কোন ভেদাভেদ নাই। কাফ্রী ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিয়া নামাযের আহবান করিতেন। নামাযের সময় প্রত্যেক মুসলমান এক সাথে নামায় আদায় করেন। ইসলামে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, বাদশাহ ও গোলাম কোনই পার্থক্য নাই। মুসলীম জাহানের এই আর্দশ আজও অম্লান রহিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর আজকের পৃথিবী বর্ন বৈষম্যের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকান্ডে ভষ্ম হইয়া চলিয়াছে।

আর বর্ণ বৈষম্যের ও শ্রেণী বৈষম্যের নিদারুন নিষ্ঠুরতা ও প্রহসন মানবতাকে করিতেছেচূর্নবিচূর্ণ।

এক বর্বর যুগের অবসান করিয়া চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সাম্যের সত্যিকার আর্দশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন আমাদের নবী করিম (সঃ)।

ইসলামী আইন বা শরীয়ত মোতাবেক যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিবে বা এক কথায় চুরি করিবে, তাহার শাস্তি হইল অংগচ্ছেদ বা সহজ কথায় হাত কাটিয়া দেওয়া। অপর দিকে যাহাতে কেহ চুরি না করে তাহার জন্য হাদিসে বর্ণিত হইয়াছেঃ "সে ব্যক্তি মোমেন নয় যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহারই প্রতিবেশী অনাহারেথাকে"। ('মেশকাত শরীফ)

"যাহার একদিনের আহার আছে, তাহার জন্য ভিক্ষা চাওয়া হালাল নয়"।। (তিরমিযী)

"দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং কাঠের বোঝা বহন করিয়া বিক্রয় কর; ইহা দ্বারা আল্লাহ তোমার মান ইজ্জত রক্ষা করিবেন। ইহা ভিক্ষা বৃত্তি অপেক্ষা উত্তম"। (বোখারী শরীফ)

"তোমার ভৃত্য খাদ্য তৈয়ারী করিয়া আনিলে তোমার উচিৎ সেই খাদ্য তাহাকেও প্রদান করা কারণ এ খাদ্য তৈয়ারী করিতে সে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়াছে"। (বোখারী শরীফ)

নবী করিম (সঃ) এর আমলে একবার অনাহারী লোকদের ভীড় জমিয়া যায়। নবী করিম (সঃ) ঘোষণা করেনঃ "যাহার ঘরে দুই জনের আহার আছে সে যেন

তৃতীয় জনকে সঙ্গে লইয়া যায়। যাহার ঘরে চার জনের আহার আছে, সে যেন ছয়জনকেসাথেলইয়াযায়।''

''হযরত আবুবকর (রাঃ) তিনজন মেহমানকে সাথে নিলেন। আর নবীজি (সঃ) তাঁহার ঘরে দশজনকে সাথে নিলেন।'' **(মেশকাত শরীফ)**

রাসুল (সঃ) বলিয়াছেন সাবধান; যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে, তাহার হক নষ্ট করিবে, যে তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবে, অথবা তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন দ্রব্য বলপূর্বক গ্রহন করিবে, কিয়ামতের দিন আমি সেই অমুসলীমের পক্ষেই উকিল হইব''। **(আবু দাউদ)**

পবিত্র কোরআনের সুরা মা'রেজ ২৪ ও ২৫ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, ''যাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তাহাদের সম্পদে অভাব গ্রস্থদের অধিকার রহিয়াছে, দান হিসাবে নয়, হক হিসাবে।

বৎস! ইসলামে রহিয়াছে মেহমানদারী, ইনসাফ এবং পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য এত কিছুর পরও যদি কেহ চুরি করে, তাহার শাস্তি হাত কাটিয়া ফেলা।

বৎস! মদীনায় ইহুদীদের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। তাহারা প্রথমে মদীনাবাসীদের সহিত যোগ দিয়া হযরতকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, হয়তো হযরতকে তাহাদের দলে দলভুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইবার নহে, তখন তাহারা ইসলামের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

মদীনায়ও গোত্রীয় পার্থক্য ছিল। হযরত ঐ সকল চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলিয়াদেন। হযরত (সঃ) স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দেশে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মদীনার সকল সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষত ইহুদিগনের সহিত সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য মদীনার সনদ (Charter) দান করিয়াছিলেন।

এইভাবে হযরত যখন মদীনায় রাষ্ট্রগঠনে ব্যস্ত তখন ইহুদীগন হযরতের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। মক্কার কুরাইশগনও সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারা মদীনার কতিপয় মুনাফিকদের সহিত একত্রিত হইয়া আবু জেহেলের নেতৃত্বাধীন মদীনা আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হইল, হযরত মোহাম্মাদ (দঃ) ও তাঁহার অনুচরদের লইয়া প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আরম্ভ হয় বদরের যুদ্ধ এইরূপে হযরত (সঃ) ওহুদের যুদ্ধ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ করিয়া যথেষ্ট শক্তি ও বিচক্ষনতার পরিচয় দেন। পরবর্তী কালে তিনি সমগ্র আরবদেশ দখল করেন

এবং চারিদিকে ইসলামের বিজয় ঝান্ডা উড়াইয়াদেন। হযরতের আদর্শ ও মহত্ব দেখিয়া দলে দলে বিভিন্ন দেশের লোক আসিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিতে থাকে।

বৎস! আল্লাহতালা তাঁহার প্রিয় নবীকে এবং ইসলাম ধর্মকে কিভাবে রক্ষা করিলেন একটু ভাবিয়া দেখ।

বৎস! আল্লাহর এবাদতের জন্য চারটি ত্বরীকা রহিয়াছে। যেমন; কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া। হাজার হাজার আলেম দ্বীন, পীর–মাশায়েখ রূপে সেচ্ছায় ঐ সকল ত্বরীকা প্রচার করিতেছেন। ঐ সকল ত্বরীকা অনুসারীগণের অন্তরে আল্লাহ ভক্তি বা প্রেম জাগরিত হইয়া আত্মা বা রূহের রুহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। সবগুলি ত্বরিকা প্রায় একই ধরনের সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। যে কোন ত্বরীকা অনুযায়ী মনযোগের সহিত আল্লাহর জিকির করাই আবশ্যক।

বৎস! "হিকমত" শব্দের অর্থ হইতেছে, দীনের সুগভীর জ্ঞান, তথা ইহার সঠিক পরিচয় ও সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুধাবন করা এবং আল্লাহর নূর ও তাঁহার সুমহান চরিত্র সম্পর্কে ধারনা লাভ করা।'।

বৎস! "এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তাঁহাকে না দেখ, তাহা হইলে তিনি তোমাকে দেখিতেছেন বলিয়া অনুভব করিবে"। **(সহীহ বুখারী ১ম খন্ড ১২ পৃঃ)**

এইভাবে আল্লাহর এবাদৎ করিতে করিতে মনের অবস্থার যে পরিবর্তন হয়, মনের ঐ বিশেষ অবস্থাকে তাছাউফ বলা হয়।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মতে "আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া সর্ব প্রকার বাতিল ধ্যান ধারণা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া নিষ্ঠার সাথে এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম অর্জন করাকেই তাসাউফ বলা হয়।"

বৎস! এই তাছাউফের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্য হইতে পশুত্ব দুরিভুত হইয়া মার্জিত চরিত্র ও মানুষের মনুষ্যত্বের জন্ম হয়।

পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারায় ১২৯ আয়াতে এই জিনিষটিকে 'তায্‌কিয়া' ও 'হিকমাত' বলা হইয়াছে এবং হাদীসে ইহাকে 'ইহসান' বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালের মুসলমানেরা ইহাকে 'তাছাউফ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'তাছাউফ' সম্পর্কে আল্লামা জাকারিয়া আনসারী বলেন, "তাছাউফ মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষাদান করে, আর নৈতিক জীবনকে করে উন্নত এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাহিরের জীবনকে গড়িয়া

তোলে।ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং লক্ষ্য হইতেছে, ''চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন করা। **(তাজ কেরাতুল আউলিয়া)**

হযরত যুননুন মিসরী (রঃ) বলেন, ''আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু পরিত্যাগ করাই 'তাসাউফ'। তাঁহাকে সূফীবাদের পিতা বলা হয়।

আল্লামা কুশাইরীর মতে, ''বাহ্য ও অন্তর জীবনের বিশুদ্ধতাই 'তাসাউফ'।

ডক্টর ইউছুফ আলকারদারী বলেন, ''তাসাউফ ঐ শিক্ষাকে বলা হয়, যাহার মধ্যে নৈতিক চরিত্র, আল্লাহর প্রেম ও ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।''

সাকাফাতুদ দাইয়াহ, বাইরুত, ১৯৮১ ইং ৯৪ পৃঃ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বলেন, ''তাছাউফ হইতেছে, পবিত্রতার জন্য মনোনীত হওয়া।''

বৎস এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা শামস, ৯–১০ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''যে ব্যক্তিনিজ আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সফলকাম হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে, সে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

বৎস। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, বিষয়টি সর্ম্পকে তুমি আরও স্পষ্টভাবে জানার জন্য ইচ্ছা করিতেছ। তবে শোন, ফিকাহ শাস্ত্র মানুষের প্রকাশ্য কার্য্য লইয়া আলোচনা করে। সেই কারণে মানুষের প্রকাশ্য কার্য্যকলাপের সাথেই জড়িত রহিয়াছে ফিকাহ শাস্ত্রের সর্ম্পক। অপর দিকে মানুষের মনের অবস্থার সাথে জড়িত রহিয়াছে 'তাসাউফের সম্পর্ক। অর্থাৎ একটির আলোচ্য বিষয় বহিরাঙ্গনে মানুষের আচরন, অপরটির আলোচ্য বিষয় মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বা।

বৎস! তোমাকে যদি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি সঠিক পদ্ধতিতে কায্যক্রমটি পরিচালনা করিয়াছ কিনা তাহাই দেখিতে চাহিবে ফিকাহ্ শাস্ত্র।

অপরদিকে ঐ কার্য্যটি সম্পাদন করিবার সময় তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিল? ইহা লইয়া ফিকাহ শাস্ত্র মাথা ঘামায় না।

উক্ত কার্য্যটি সম্পাদনের সময় মানুষের মনের অবস্থার সহিত তাছাউফের সম্পর্ক। কোন কার্য্য সম্পাদনের মানুষের মনের অবস্থার সহিতই 'তাছাউফ' জড়িত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তুমি নামায আদায় করিয়াছ, ফিকাহ শাস্ত্র কেবলমাত্র তোমার ঐটুকুই লক্ষ্য করিবে যে, তুমি নামাজের সমস্ত অপরিহার্য্য পদ্ধতি বা নিয়মকানুন সঠিকভাবে পালন করিয়াছ কিনা?

বৎস! তুমি যদি পবিত্র নামাজ আদায়ের সমস্ত শর্ত বা নিয়ম-কানুন যথাযত ভাবে পালন করিয়া থাক, তাহা হইলে ফিকাহ শাস্ত্রানুযায়ী তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাসাউফের বিষয়টি হইল নামায পড়ার সময় তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিল? তোমার মন নামায পড়ার সময় আল্লাহর দিকেই ছিল, না পার্থিব সমস্যা যেমন; বাজার করা, প্রতিবেশীর সহিত কিভাবে ঝগড়া করিয়া দমন করা যায়, কিভাবে অবৈধ সম্পদ কামাই করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে মনটা ভরপুর ছিল। বৎস! নামায আদায় করার সময় মন পবিত্র থাকিতে হইবে সমস্ত প্রকার হিংসা, ক্রোধ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে, পবিত্র থাকিতে হইবে। তবেই সে নামায সঠিক হইবে।

বৎস! সঠিকভাবে নামায পড়ার ফলে তোমার আত্মার কতটুকু উন্নতি হইয়াছে বা তোমার আত্মা কতটুকু বিশুদ্ধ হইয়াছে? তোমার চরিত্র কতটুকু সংশোধন হইয়াছে? ইত্যাদি প্রশ্ন তাছাউফের আলোচ্য বিষয়।

বৎস! মানুষের পাপ কার্য্য করাই যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন আইনের ভাষায় তাহাকে অভ্যাসগত অপরাধী বলে।

ক্রমাগত ভাবে পাপ কার্য্য করিতে করিতে মানুষের আত্মায় কালিমা পড়িয়া যায়। তাছাউফের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদৎ করিলে মানব আত্মার কালিমা দুরিভূত হইয়া আত্মা শুভ্র হয়, উজ্জ্বল হয়, তেমনি ভাবে পবিত্র মনের ও পবিত্র আত্মার এবাদৎ আল্লাহ পছন্দ করেন এবং কবুল করেন। ফলে বান্দার গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

বৎস! পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভালবাস, তাহা হইলে আল্লাহকে অনুসরন কর, আর তাহা যদি করিতে পার, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সুরা আল ইমরান, আয়াত, ৩১) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে হইলে, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া পাইতে হইলে, আল্লাহকে ভালবাসিতে হইবে এবং ভয়ও করিতে হইবে।

বৎস! রাসুলকে অনুসরন করিলে সহজেই আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়। কারণ আমাদের রাসুল হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী। যাঁহাকে অনুসরণ করিলে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে। এবং পাওয়া যাইবে আল্লাহর বন্ধুত্ব।

এই সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, ''প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ বর্তমান আছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য যাহা ইহজগতে এবং পরজগতে আল্লাহর নৈকট্য আনয়ন করে।

(সুরা আল্ আহযাব, আয়াত, ২১)

বৎস! সুরা আল হাশর এর ৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''রাসুল তোমাদের জন্য যাহা লইয়া আসিয়াছেন, তোমরা তাহা গ্রহন কর এবং তিনি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা বিরত হও।''

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসুল বলেন, ''আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ রাখিয়া যাইতেছি, ইহার একটি হইল পবিত্র 'কোরআন শরীফ' এবং অন্যটি হাদীস'।

এই দুইটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিলে তোমরা কখনও গোমরাহ হইবেনা।

(আল্ মুসতাদরাকলিল হাকিম)

বৎস! এই সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ''তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমরা নিঃসন্দেহে গোমরাহ হইয়া যাইবে। **(সহীহ মুসলীম)**

বৎস! উপরোক্ত আলোচনা হইতে নিশ্চয়ই স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছ যে, 'তাসাউফ' কি?

বৎস! পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ বিবর্জিত তাসাউফ কোন তাছাউফই নয়, বরং উহা প্রতারনার ও ভন্ডামীর নামান্তর মাত্র।

পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ও ভিত্তিতে যে তাছাউফ, তাহাকেই তাছাউফ বলা যাইবে, ইহার সামান্যতম ব্যতিক্রম হইলেও তাহাতে ভন্ডামীর মাধ্যমে প্রতারনা করা যাইবে, কিন্তু আল্লাহর ভালবাসা বা নৈকট্য লাভ হইবে না।

বৎস! সতর্ক হও! পৃথিবীতে মানবরূপী বহু শয়তান আছে সুতরাং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পীর বলিয়া বিশ্বাস করা উছিৎ নহে। ''যার তার হাতে হাত মিলাইও না। ওরা শয়তানী করে এবং ওলীর দাবী করে। তবে এমন ওলীর প্রতি (কোরআন ও হাদিস বিবর্জিত) সৃষ্টিকর্তার বা মহান স্রষ্টার অভিশাপ পতিত হোক।''

(শেখ সাদী ঃ গুলিস্তান)

বৎস! আল্লাহপাক বলেন, ''সূফী ও মোমেন ব্যক্তি তাহারাই, যাহারা আল্লাহর নবী প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পালন করে' বা ইসলামের অনুসারী। আর আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। (সুরা আল ইমরান, আয়াত, ১৯।) ''ইসলাম ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি কোন জীবন ব্যবস্থা অনুসরন করে, তাহা কখনও কবুল

ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি কোন জীবন ব্যবস্থা অনুসরন করে, তাহা কখনও কবুল করা হইবে না। আর পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।'

(সুরা আল ইমরান, আয়াত—৮৫)

বৎস! কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, সে বিষয়ে প্রাচীনকালের সুফীদের মতামত সম্পর্কে তোমাকে কিছু জানা দরকার।

স্পেনের মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (১১৬৫–১২৪০ খৃঃ) অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'ফুসুসুল হিকাম' নামক পুস্তকে স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আল্লাহর অংশ এবং সমস্ত কিছুর মধ্যেই তিনি বিদ্যমান। ঐ পুস্তকটি, সুফী দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক।

''ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'' বা সর্বেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া প্রেম সাগরে বা প্রেমের পথেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।

বৎস! ঐ সময় হইতেই আরম্ভ হয় সুফী প্রেম সঙ্গীত ও সুফী কাব্য রচনা। সুফীগন আল্লাহকে ''পরম সুন্দরী'' রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেন। ইহার পর ১১৮১–১২৩৫ খৃঃ মিসরবাসী 'ইবনুল ফরীদ' তাহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ''দিওয়ান'' রচনা করিয়া সুফী প্রেম সঙ্গীতকে সাধনার স্তরে পৌছাইয়া দেন।

সুফীবাদের উপর সব চাইতে পান্ডিত্য প্রদর্শন করেন প্রখ্যাত পারস্য কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (১২০৭–১২৭৩ খৃঃ)।

তাঁহার রচিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'মসনবী'। এই পুস্তকটি একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থটি ৬ খন্ডে রচিত হইয়াছে এবং ইহাতে প্রায় ত্রিশ হাজার কবিতা রহিয়াছে। তিনি যুক্তি দিয়াছেন, ''শয়তানের প্রেম নকল প্রেম'' আর আল্লাহর প্রতি প্রকৃত প্রেমই হইল মানুষের প্রেম।''

অর্থাৎ শয়তান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে, সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে যুক্তিতর্ক করে, আর মানুষ যে, সে তাহার সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য প্রেম সাগরে ঝাঁপ দেয়। তাই তিনি আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হইয়া ভাব নৃত্যে অংশ গ্রহন করার পক্ষপাতি ছিলেন।

তাঁহার মতে ''ভাব সমাধি; 'দশা' বা 'হাল' এই সবের মাধ্যমেই পরম সত্যকে জানা যায়।''তবে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী ভাব সমাধির শেষ পর্য্যায়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিয়া ফানাফিল্লায় পৌছাকে পছন্দ করিতেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন, ''সত্য, কল্যান ও সুন্দরের প্রতি প্রেম এবং পরিশেষে মানুষ হিসাবে

অপর মানুষকে ভালবাসাই 'আল্লাহ ভক্তি' বা প্রেমের পথ।'' যাহাতে তিনি 'সিরাজুম মুনীর' বা "শ্রেষ্ঠ আলোর পথ" বা 'আলোর বর্তিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।''

মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর শিষ্যগণকে বলা হয় ''নাচিয়ে দরবেশ।'' তিনিই সর্ব প্রথম সঙ্গীতকে সাধনার অঙ্গ রূপে বিশ্বাস করিতেন।

''নাচিয়ে দরবেশরা'' বিশ্বাস করিতেন যে, সঙ্গীত মানুষের প্রাণে ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে অলৌকিক স্পন্দন। যাহা সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম। সুফিগণ পূর্বে যেমন খুশী তেমনভাবে নিজেদের ইচ্ছামত এবং ধর্মগুরুদের ইচ্ছামত তাঁহাদের আদর্শ প্রচার করিতেন।

পারস্য কবি হাফিজ ও সেখ সাদী সুফি মতাদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রেমের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুফীরা যখন ঐরূপ বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচারে ব্যাস্ত, তখন তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন অপর এক ধাবমান নক্ষত্র, শিঘ্রই যাহার সুনাম ও আলোক রশ্মি দিক দিগন্তকে আলোকিত করিল সেই মহাপন্ডিত মহাজ্ঞানী, মহাজন যিনি মাতৃগর্ভ হইতেই আল্লাহ প্রদত্ত্ব এল্‌মে মারেফাত এবং নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা লইয়া জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন, সেই মহা পুরুষই হইলেন সৈয়দ মহী উদ্দীন, হয্‌রত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁহার সুগন্ধে সমস্ত সুফীগন মাতয়ারা হইয়া যান। মধু আহরনের নেশায় তাঁহারা পিপিলিকার ন্যায় দলে দলে তাঁহার নিকট গমন করেন।

তাঁহার পরশে সমস্ত সুফিগন একমতাদর্শে উপনীত হইয়া সঙ্গবদ্ধ হইলেন। তাঁহার মতার্দশকেই 'কাদেরীয়া ত্বরীকা' বা 'কাদেরীয়া উপাসনা পদ্ধতি' বলা হইয়া থাকে।

মুসলিম জাহানের ধর্মীয় জগতে এই ত্বরীকা বা উপাসনা পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়। এই পথের অনুসারীগণ শিঘ্রই ইহজগৎ ও পরজগতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জন করিতে পারেন।

কাদেরীয়া, চিশতীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া ত্বরীকার মধ্যে খুব একটা বৈসাদৃশ্য নাই বরং সাদৃশ্য রহিয়াছে। সমস্ত ত্বরীকার বা পদ্ধতির একই লক্ষ্য, তাহা হইল আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভক্তি হৃদয়ে জাগরিত করা, পরম করুনাময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, যাবতীয় পাপকার্য্য পরিহার করিয়া মুক্তির পথে ধাবিত হওয়া।

সুফীগন অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা অনেকই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন আল্লাহর নৈকট্য এবং আল্লাহর ভালবাসা।

''বাংলার শ্রী চৈতন্য কোন একজন তুর্কী দরবেশের নিকট হইতে এই ভাব সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা প্রচার করিতে থাকেন।''

বৎস! কাদেরীয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও নক্সাবন্দিয়া এই চারিটি ত্বরীকার যে কোন ত্বরীকা পছন্দ করিয়া সঠিকভাবে পালন কর, চেষ্টা কর আল্লাহর নৈকট্যলাভেরজন্য।

বৎস! আল্লাহ জগতের মানুষের যেন মানুষরূপী শয়তানের ধোকা হইতে বাঁচাইয়া খাঁটি মুসলীম ও মোমেন বান্দা হিসাবে জীবন যাপনের তওফিক দান করেন।

বৎস! জগতের সবাই আমরা মুসাফির। সবাইকে আমার মতই আল্লাহর দরবারে যাইতে হইবে, আর ছাড়িতে হইবে এই ক্ষনিকের নীড়। আমাকে এখন বিদায় দাও। ''তোমার নকিব তোমার মসজিদে'' স্মরন রাখিও।

''দিগন্তের মুসাফির! পথ চল একা
দিগন্ত বিহীন তোমার পথ ---।

সাহায্য কারী পুস্তক ও পত্র পত্রিকা

১। পবিত্র কোরআন শরীফ, বঙ্গানুবাদ
আলহাজ্ মাওলানা এ, কে, এম ফজলুর রহমান মুন্সি
২। পবিত্র কোরআন শরীফ, বঙ্গানুবাদ
মোঃ আব্দুল হাকিম ও মোঃ আলী হাসান
৩। এহ্ইয়াও উলুমিদ্দীনঃ–হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ)
বঙ্গানুবাদ–আলহাজ মাওলানা ফজলুল করিম
৪। মুক্তির পথ–ফজলুর রহমান খাঁ
৫। কিমিয়ায়ে সাদাত–হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ)
৬। বোখারী শরীফ
৭। মেশকাত শরীফ
৮। মুসলীম শরীফ
৯। তিরমিযী শরীফ
১০। ইবনে মাসউদ
১১। গুলিস্তানঃ–শেখ সাদী
১২। মসনবীঃ–মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী।
১৩। ফুসুসুল হিকামঃ–মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী।
১৪। দিওয়ানঃ–ইবনূল ফরীদ।
১৫। সাকাফাতুদ দাইয়াহঃ–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী।
১৬। তাজকেরাতুল আউলিয়া।
১৭। মানবতার মুক্তির পথঃ–অধ্যাপক আব্দুর রায্যাক।
১৮। আলো ঝলমল বন্দরেঃ–জয়নূল আবেদীন মাহবুব।
১৯। নেয়ামুল কোরআন
২০। মহাভারত শান্তি পর্ব।
২১। বিবর্তন বাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বঃ–মুহম্মাদ আব্দুর রহীম।
(প্রথম সংস্করন, মার্চ, ১৯৮২)
২২। আধুনিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কোরআন
অধ্যাপক গোলাম ছোবহান।
২৩। রাষ্ট্রতত্ত্বঃ–মফিজুল ইসলাম
২৪। ইসলামের ইতিহাসঃ–কে. আলী

পত্র—পত্রিকাঃ—

১। মাসিক সবুজ পাতাঃ—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
২। সাপ্তাহিক বাংলা ম্যাগাজিন ''অগ্রপথিক''
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
৩। ''সাপ্তাহিক আরাফাত''।
৪। দৈনিক ইত্তেফাক।
৫। দৈনিক সংগ্রাম।
৬। দৈনিক ইনকিলাব।
৭। মাসিক আল্‌কোরান।
৮। মাসিক মদীনা।
৯। দৈনিক আযাদ।
১০। পাক্ষিক প্রতিরোধ।
১১। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

ডারউইনের বিবর্তন—তত্ত্ব

চার্লস ডারউইন উপাস্থাপিত বিবর্তন বা ক্রম বিকাশ তত্ত্বের (Theory of Evolution) মূল ভিত্তি ৬টি।
৬ ''জীব জন্তু ও প্রানী প্রজাতি ও জাতি সমূহের অধিকাংশ শাখা—প্রশাখা ও স্তর এতই সন্নিহিত ও সুসংবাদ পরিদৃষ্ট হয় যে, একটি প্রজাতি অপর একটি প্রজাতির ক্রমবিবর্তিত আকার—আকৃতি—বলে স্পষ্ট মনে হয়। আর এ ক্রম—অব্যাহত ধারা একথা প্রমানিত করে যে, মানুষ যে মানুষ ও বানর—উল্লুকের—ক্রমবিকশিত ও বিবর্তিত আকার—আকৃতি। আর এ গোটা ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তনের ধারার প্রাথমিক স্তর কোন এক কোষ (Life cell) সম্পন্ন জীবানু হবে বলে ধারনা জন্মে''
[গ্রন্থ ''বিবর্তন বাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব'']/পৃষ্টা—৫০
কৃত মুহাম্মদ আবদুর রহীম
মার্চ—১৯৮২
প্রথম সংস্করণঃ